মহা উপদেশ

(‘আদী ইবন মুসাফিরের অনুসারীদের এর কাছে লেখা চিঠি)

الوصية الكبرى

< بنغالي >

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ

৯০৩

অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الوصية الكبرى

رسالة

شيخ الاسلام ابن تيمية

إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي

ترجمة: ذاكرالله أبو الخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

অনুবাদকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

“নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের খারাবী থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন, তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীগণের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের প্রতি অধিক দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি তার বান্দাদের যে কোনো উপায়ে ক্ষমা করতে ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন।

আমরা সরল পথে চলতে চাই, হক জানতে চাই। অথচ সুপথ পেতে হলে রব হিসেবে আল্লাহকে মানতে হবে, তাগূতকে বর্জন করতে হবে, জীবনাদর্শ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে এবং

তাকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে মানতে হবে। রাসূলের জীবনেই আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বাতিল আদর্শ পরিত্যাগ করতে হবে।

'মহা উপদেশ' গ্রন্থটির মূল আরবী শিরোনাম হলো 'আল ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা'-এর লেখক হলেন বৈপ্লবিক সংস্কারক আল্লামা তাকী উদ্দীন আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ। তিনি এ বইটি বিশেষ একটি পেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লিখেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে ইরাকের মূসেল শহরে শাইখ 'আদী ইবন মুসাফির আল-উমুবী আল-হাক্কারী রহ. নামে একজন প্রখ্যাত আলেমে দীন বসবাস করতেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ নেক বান্দা। কুরআন ও সুন্নাহের অনুসারী বড় বড় শাইখদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। তৎকালীন সময়ে উম্মতের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল আলোচিত এবং তার প্রশংসা ছিল উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে তার একটি ভালো প্রভাব ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও সম্মান ছিল তা সীমা ছড়িয়ে যায় এবং অতি উৎসাহীরা একটি গোমরাহ দলে পরিণত হয়। ফলে তাদের অত্যধিক বাড়াবাড়ি এমন আকার ধারণ করে যা তাদের শাইখ 'আদী যে সত্যের ওপর ছিলেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও সঠিক ইসলামী আকীদা ধারক-বাহক ছিলেন তার প্রতি তাদের ভালোবাসা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে মুসলিম আলেম যারা বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী তাদের ওপর দায়িত্ব হয়ে দাড়ায় তারা যেন তাদের আকীদাকে সংশোধন করে দেয় এবং যারা সত্য থেকে দূরে সরে গেছে তাদের

সঠিক পথের ওপর পরিচালনা করে এবং তাদের সঠিক পথের ওপর ফিরিয়ে আনে।

এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করার জন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. এগিয়ে আসেন। তিনি ‘আদী ইবন মুসাফির রহ. অনুসারীদের নিকট একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি তাদের পূর্বসূরি মাশাইখগণ যাদের তারা অনুসরণ করছে, যাদের চলার পথে তারা হাঁটছে তারা যে সত্যের ওপর ছিল তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। আরও জানিয়ে দেন যে, তাদের জন্য উচিৎ হচ্ছে তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহকে মজবুত করে ধরে। এ ছাড়াও তিনি এ রিসালাটিতে তাদের পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টতার কারণসমূহ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেন। যাতে করে যে জীবিত থাকে সে যেন দলীলের ভিত্তিতেই জীবিত থাকে আর যে মারা যায় সেও যেমন দলীলের ভিত্তিতে মারা যায়। তারপর এ রিসালাটি ‘আল ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রিসালাটি মাজমু‘আয়ে ফাতওয়ায়ে ইবন তাইমিয়্যাহ-এর তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। তবে রিসালাটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য বিষয়গুলো জানা থাকা খুবই জরুরি। এ রিসালাটিতে ইসলামী আকীদাগুলো তুলে ধরা হয়েছে যা জানা থাকা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরয। এ ছাড়াও আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্বকে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এ বইটিতে মুসলিম জাতির বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে তার সমাধান কি হতে পারে বিজ্ঞ লেখক তা নির্ণয় করে দিয়েছেন। বইটিতে প্রথমে তিনি এ উম্মতের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতকে ইসলামী শরী‘আতের মতো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ও দীন দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সমস্ত উম্মত ও জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন -তা আলোচনা করেছেন। এ উম্মতের

বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সামষ্টিক গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ যে উম্মতের চলার একমাত্র পাথেয় এবং ইসলামী শরী'আতের একমাত্র মানদণ্ড ও প্রমাণ তা এ কিতাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নবী রাসূল, আসমানী কিতাব, ফিরিশতা সম্পর্কে মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাস কি হওয়া উচিৎ তার একটি সমাধান এ বইটিতে আলোচনা করা হয়। একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাতসহ এমন কিছু বাকী রাখেন নি যে বিষয়ে সংক্ষেপে এ বইটি আলোচনা করা হয় নি। তৎকালীন যুগের বিভিন্ন ফিতনা, বিবাদ ও মতানৈক্য বইটিতে তুলে ধরে এ সব ফিতনা বিবাধের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যে একটি মধ্যপন্থী উম্মত তা এখানে তুলে ধরা হয়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ গবেষণা করে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব।

আল্লামা ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. যে উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতিকে উপদেশ প্রদান করেছেন তা যদি আজকের মুসলিম বিশ্ব গ্রহণ করে তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য, গঠিত হবে সার্বজনীন বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। নিরসন হবে হাজারো বছরের দলীয় ফাসাদ, হাঙ্গামা ও পরস্পর কাঁদা ছোড়া-ছুড়ির নোংরা পথ। প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখণ্ডিত মুসলিম সমাজ। বইটির গুরুত্ব মুসলিম ভাইদের জন্য কত যে অপরিসীম তা কাগজ কলমে লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে বর্তমান ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে বইটি ইসলামী গবেষক ও দা'ঈ ভাইদের আত্মার বিশেষ খোরাক, চলার পথের পাথেয়। তাই বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাতে বইটি তুলে দেওয়া খুবই জরুরি। কারণ, আমাদের দেশে বিদ'আত, শির্কের যে ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে তা হতে জাতিকে রক্ষা করতে এ অসাধারণ বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার

বিশ্বাস। এ ছাড়াও দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, বিভক্তি ইত্যাদি নিরসনে একটি সার্বজনীন সমাধান এ বই থেকে গ্রহণ করা যাবে। তাই বইটি অনুবাদ করার এ মহৎ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি যাতে করে এ দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইয়েরা উপকৃত হন। এ বইটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেকেই করেছেন। তবে আমি যাদের লিখিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বইটি অনুবাদ করেছি, তারা হলেন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন-নামির ও উসমান জুম'আহ দামীরীয়্যাহ। তারা তাদের ব্যাখ্যায় কুরআনের প্রয়োজনীয় আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন। যেখানে আয়াতটি সংক্ষেপে আনা হয়েছে সেখানে তা বুঝানো জন্য পুরো আয়াতটি তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও হাদীসের তাখরীজসহ বিভিন্ন মাশায়েখদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। তবে আমি আমার অনুবাদে তাদের ব্যাখ্যা ও টিকাসমূহ সম্পূর্ণ এখানে নিয়ে আসে নি। আমি শুধু প্রয়োজনীয় আয়াত, গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের তাখরীজ হাদীস সহ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ ছাড়াও যে বিষয়টিকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি সে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করি আল্লাহ যেন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করেন। আমীন।

জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহর পক্ষ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের প্রতি... অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী, শাইখ "আবুল বারাকাত 'আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী" রাহিমাহুল্লাহ এর অনুসারী ও যারা তাদের মত রয়েছে এমন সকলের প্রতি এ চিঠি। আল্লাহ তাদেরকে তার রাস্তায় চলার তৌফিক দিন, তার ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করুন, তার রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণকারী হিসেবে প্রস্তুত করুন, তাদেরকে সে পথের হিদায়াত দিন, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন -সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ তথা সৎ লোকদের পথ। আর তাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট এবং বক্রপথের অনুসারীদের পথ থেকে দূরে রাখুন, যারা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে যে শরী'আত ও পন্থার ওপর প্রেরণ করেছেন সে পথ থেকে বেরিয়ে গেছে। যাতে করে তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে হতে পারে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত; যাদের ওপর আল্লাহর দয়া প্রকাণ্ড আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

সালামুন আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহূ।

অতঃপর,

আমরা অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব, যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই। তিনিই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন বনী আদমের সরদার, সমস্ত নবীদের শেষ নবী, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত মাখলুক, আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি, যার মর্যাদা তার নিকট সব চেয়ে মহান -সেই নবী মুহাম্মাদ তার বান্দাও

রাসূল এবং তার সাথী-সঙ্গী ও পরিবার-পরিজনের ওপর অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর,

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সব ধর্মের ওপর তা বিজয়ী করেন; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। তার প্রতি শাশ্বত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও হিফাযতকারীরূপে। তিনি তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য ও তাঁর উম্মতের জন্য দীনকে পূর্ণ করেছেন। তাদের জন্য নি'আমতকে সম্পন্ন করেছেন এবং তাদেরক সর্বোত্তম জাতি বানিয়েছেন যাদের মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তারা ৭০টি উম্মতকে পূর্ণতা দিয়েছে (অর্থাৎ তারা সত্তরতম উম্মত), তবে তাদের মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ সম্মানী। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যপন্থী অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোত্তম জাতি বানিয়েছেন।

আল্লাহ কর্তৃক উম্মতে মুহাম্মাদীকে দু'টি বিষয়ের হিদায়াত প্রদান

আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে অন্যান্যদের ওপর সাক্ষী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

- আল্লাহ এ উম্মতকে হিদায়াত দিয়েছেন সে দীনের, যে দীন নিয়ে পাঠিয়েছেন সকল রাসূলকে এবং যে দীনকে তিনি সকল সৃষ্টির জন্য প্রবর্তন করেছেন।
- তারপর তিনি এ উম্মতকে বিশেষিত করেছেন তাদের জন্য নির্ধারিত এমন শরী'আত ও জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে, যা দ্বারা তাদেরকে তিনি বিশিষ্ট ও সম্মানিত করেছেন।

প্রথমটির উদাহরণ

○ তন্মধ্যে প্রথমটি (তথা আকীদার বিষয়সমূহ এবং শরী‘আতের কিছু স্থায়ী মৌলিক নীতিমালা যা সর্বযুগে সবার জন্য প্রযোজ্য ছিল) এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, ‘ঈমানের মূলনীতিসমূহ’ যার সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায় হচ্ছে, তাওহীদ। আর সে তাওহীদ হচ্ছে, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করি নি যার প্রতি এ অহী প্রেরণ করা হয় নি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“প্রত্যেক জাতির কাছে আমরা রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত কর, আর তাগুতকে বর্জন কর”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ٤٥﴾ [الزخرف: ٤٥]

“তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদাত করা যায়”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣﴾ [الشورى: ١٣]

"তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি ওহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে -তা এই যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কর না, তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছ তা তাদের নিকট কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ٥٢﴾ [المؤمنون : ٥١، ٥٢]

"হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার কর, আর সৎ কাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত। আর তোমাদের এই জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের 'রব'। অতএব তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর"। [সূরা আল-মুমিমূন, আয়াত: ৫১-৫২]

○ এর আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবসমূহ ও তার নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦]

“তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা হযরত ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের রব হতে প্রদত্ত হয়েছিলেন, সব কিছুর ওপর ঈমান এনেছি। তাদের মধ্যে (ঈমানের ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী-মুসলিম”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ١٥﴾ [الشورى: ١٥]

“আর বল, আল্লাহ যে কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (ন্যায়বিচার) করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে”। [শূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦]

“রাসূলের প্রতি তার রব হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তিনি ঈমান আনেন এবং মুমিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ তা‘আলাকে, তার ফিরিশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে এবং তার রাসূলগণের ওপর ঈমান এনে থাকে এবং (তারা বলে) আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না এবং তারা এ

কথাও বলে যে, ‘আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের ‘রব’ আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে। কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা‘আলা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না, কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই ওপর বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের রব! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫, ২৮৬]

○ অপর একটি উদাহরণ হলো, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ও তাতে যে সওয়াব ও শাস্তির বিবরণ এসেছে তার ওপর ঈমান। যেমনটি আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুমিনদের মধ্য থেকে যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন। ফলে তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢﴾ [البقرة: ٦٢]

“নিশ্চয় যারা মুমিন, আর যারা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের ‘রব’ এর নিকট পুরস্কার। তাদের কোনো প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৬২]

○ অনুরূপভাবে এর আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে, ইসলামী শরী'আতের মূলনীতিসমূহ, যার আলোচনা সূরা আল-আন'আম, সূরা আল-আ'রাফ, সূরা বনী ইসরাঈল ও অনুরূপ বিভিন্ন মক্কী সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে নির্দেশনা এসেছে, এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার; যার কোনো শরীক নেই, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, চুক্তি পূর্ণ করা, সত্য কথা বলা, ওজন ও মাপে ঠিক দেওয়া, বঞ্চিত ও প্রার্থীকে সাহায্য করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গর্হিত কাজ ত্যাগ করা[1], গোনাহ ও অন্যায় কর্মে সীমালঙ্ঘন না করা, দীনী

---

[1] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١﴾ [الانعام: ١٥١]
"বল, 'এসো, তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওযন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫১-১৫৩]

বিষয়ে না জেনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এ ছাড়াও তাওহীদের সাথে আরো অর্ন্তভুক্ত হল, আল্লাহ তা‘আলার দীনকে নির্ভেজালভাবে কেবল আল্লাহর জন্য পালন করা[2], আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করা,[3] তার রহমতের আশা করা[4] ও আল্লাহকে ভয় করা[5], আল্লাহ তা‘আলার বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করা[6], তার বিধানের প্রতি আজ্ঞাবহ হওয়া[7], তোমার নিকট তোমার

---

[2] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣] “বল, ‘আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না’। [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩]

[3] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٣﴾ [المائدة: ٢٣] “আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও’। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২৩]

[4] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢١٨﴾ [البقرة: ٢١٨] “নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৮]

[5] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٣﴾ [المائدة: ٣] “সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

[6] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورٗا ٢٤﴾ [الانسان: ٢٤] অতএব তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগত্য করো না”। [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ২৪]

[7] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ﴾ [الانفال: ٢٤] “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে”। [সূরা আলা-আনফাল, আয়াত: ২৪]

পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমগ্র পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক প্রিয় হওয়া[৪] ইত্যাদি। এ সব ঈমানের মূলনীতি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের মক্কী সূরাসমূহে এবং কিছু মাদানী সূরার বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন।

শরী'আত

দ্বিতীয়টির বর্ণনা

দ্বিতীয় বিষয়টি (তথা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য যেসব বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা মাদানী সূরাসমূহে তার দীনের যে সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য যে সব সুন্নাত প্রচলন করছেন। (যাকে শরী'আত বলা হয় আর তা শুধু এ উম্মতের জন্য বিশেষভাবে প্রণয়নকৃত)।

---

[৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ۝١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥] "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ» "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করবে। এক- আল্লাহ ও তার রাসূল দুনিয়ার সবকিছু থেকে তার নিকট হওয়া । দুই-কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। তিন-কুফর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাতে পূণরায় ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করা যেমন আগুনে নিক্ষেপ করাকে অপন্দ করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩)।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর ওপর কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা এ দ্বারা মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। আর তিনি তার নবীর স্ত্রীদেরকে কিতাব ও হিকমত নিয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ﴾ [النساء : ١١٣]

“এবং আল্লাহ তা‘আলা তোমার প্রতি গ্রন্থ ও হিকমাহ (হাদীস) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীস) শিক্ষা দিচ্ছে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ﴾ [الاحزاب: ٣٤]

“আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (হাদীস) এর কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৪][9]

---

[9] আয়াতে হিকমতের তাফসীরে একাধিক মত পাওয়া যায়। কাতাদাহ বলেন, “হিকমত হলো কুরআন ও সুন্নাহ”।

সালফে সালেহীনের অনেকেই বলেছেন, হিকমাহ হলো সুন্নাহ বা হাদীস। কেননা, কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হতো তা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

«ألا وإني أُوتيت الكتاب ومثله معه»

“সাবধান! আমাকে কিতাব ও তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেওয়া হয়েছে”।[10]

ইমাম শাফে‘ঈ রহ. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো কুরআন। আর হিকমত উল্লেখ করেছেন। আর এ বিষয়ে আহলে ইলমদের মধ্য থেকে যিনি কুরআন বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ তার থেকে শুনেছি তিনি বলেন, হিকমত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। এ কথাটি একথারই মতো যে, কুরআন হলো যিকির এবং তার সাথেই রয়েছে হিকমত। আর আল্লাহ তা‘আলা তার মাখলুককে কুরআন ও হিকমত শেখানোর মাধ্যমে যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তার আলোচনা করেন। তবে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য এখানে শুধু সুন্নত। কারণ, সুন্নাত আল্লাহর কিতাবের বাহিরে নয় আল্লাহর কিতাবেরই অংশ। আল্লাহ তা‘আলা তার স্বীয় রাসূলের আনগত্য করাকে ফরয করেছেন এবং তার নির্দেশ মানাকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং কোন কথা বিষয়ে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফরয তারপর তার রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী। কারণ, আমরা আগেই বলেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনাকে তার প্রতি ঈমান আনার সাথে একত্র করে দিয়েছেন। দুটিকে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নাই। রাসূলের সুন্নাত হলো, আল্লাহ তা‘আলা কি বুঝাতে চেয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা। আর এটি আল্লাহ তা‘আলা তার মাখলুকের মধ্য থেকে আর জন্য রাখেন নি একমাত্র স্বীয় রাসূল ছাড়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: রিসালাতুশ শাফে‘ঈ: ৭৮-৭৯)

[10] সুনান আবু দাউদ, ৭/৭, সুনান তিরমিযী, ৪২৬/৭, সুনান ইবন মাজাহ, ৬/১, মুসনাদে আহমাদ।

হাসসান ইবন আত্বিয়া[11] বলেন, ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম যেরূপ কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হতেন, তেমনি হাদীস নিয়েও অবতরণ করতেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআনের ন্যায় হাদীসও শিক্ষা দিতেন’।

শরী‘আতের বিধানসমূহের দৃষ্টান্ত, যার প্রতি আল্লাহ তা‘আলা এ নবী ও তার উম্মতকে হিদায়াত দিয়েছেন:

যেমন,

কিবলা, কুরবানি বা ইবাদতপদ্ধতি, জীবন-ব্যবস্থা, সঠিক পথ প্রভৃতি। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত সংখ্যায় সময়মত আদায় করা, কিরাত পড়া, রুকু ও সাজদাহ করা, কিবলা তথা বায়তুল্লাহিল হারামের দিকে মুখ ফিরানো।

এ ব্যাপারে আরো দৃষ্টান্ত: ফরয যাকাত ও তার পরিমাণ যা তিনি মুসলিমদের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে ফরয করেছেন। যথা গবাদি পশু, শস্য, ফলমূল, ব্যবসায়ীক পণ্য, স্বর্ণ, রূপা প্রভৃতি। আর যারা যাকাতের মালের হকদার। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

“সদকা হলো ফকীর, মিসকীন ও সদকা (আদায়ের) জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী এবং যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, আর গোলামদের আযাদ করার

[11] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, ইবাদাতকারী ও ফকীহ। আল্লামা আওযা‘ঈ রহ. বলেন, আমি তার থেকে অধিক ইজতেহাদকারী ও অধিক আমলকারী আর কাউকে পাইনি। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি তার যুগের শ্রেষ্ট যারা তাদের অন্যতম। একশত বিশের পর তিনি মারা যান। তাহযীবুত তাহযীব ২১৯-২২০/২

কাজে ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আর জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এ হুকুম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও অতি প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

অনুরূপ শরী'আতের বিধি-বিধানের আরো দৃষ্টান্ত হলো, রমযান মাসের সওম পালন, বায়তুল্লাহিল হারামের হজ সম্পাদন করা। আর ঐসব নিয়ম কানুন ও সীমারেখা যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বিবাহ, মিরাস, শাস্তি, ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর ঐসব সুন্নাহসমূহ যা তিনি 'ঈদ, জুমু'আ, ফরয সালাতের জামা'আত এবং কুসূফ, ইসতিসকা, জানাযা ও তারাবীর সালাতে সুন্নাত হিসাবে বিধিবদ্ধ করেছেন।

আর শরী'আতের বিধানসমূহের আরো দৃষ্টান্ত: যা তিনি অভ্যাগত রীতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। যথা: খাদ্য গ্রহণ, পোশাক পরিধান, জন্ম-মৃত্যু বিষয়ক কার্যাবলী, শিষ্টাচার ইত্যাদি। আর ঐসব আহকাম যেগুলো তাদের মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলেরই বিধান বলে বিবেচিত। যেমন খুন-খারাবী, আত্মসাৎ, বিবাহ-সাদি, লাভ লোকসান ইত্যাদির বিধান, যা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য তার নবীর জবানে উম্মতের জন্য প্রচলন করেছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিদর্শনসমূহ:

ক. আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ এবং বিচ্ছিন্নতা ও সামগ্রিক পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি:

আর মুক্তিপ্রাপ্তদল, আল্লাহ তা'আলাই তাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাদের অন্তরে তাকে (ঈমানকে) সু-সজ্জিত করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে তার রাসূলের অনুসারী বানিয়েছেন। পথভ্রষ্টতার ওপর ঐকমত্য হওয়া হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন, যেমন তাদের পূর্বে বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এ কারণেই যখন পূর্বের কোনো জাতি পথভ্রষ্ট হত, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করতেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

"আর আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর এবং তাগুতকে (সীমালঙ্ঘনকারীকে) পরিহার কর"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ ٢٤﴾ [فاطر: ٢٤]

"এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি"। [সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ২৪]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তারপর কোনো নবী নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার উম্মতকে পথভ্রষ্টতার ওপর মতৈক্য হওয়া থেকে নিরাপদ করেছেন এবং এ উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাদের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত দীনের দলীল প্রতিষ্ঠা

করবেন। এ কারণেই তাদের ইজমা (মতৈক্য হওয়া) দলীল, যেমনিভাবে কুরআন ও হাদীস দলীল।[12]

---

[12] কারণ, হাদীসে এসেছে, আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর ওপর একত্র বা একমত হবে না। এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে আবু মালেক আল-আশ'আরী, ইবন উমার, ইবন 'আব্বাস, আনাস, সামুরাহ, আবূ নাযরাহ, আবু উমামহ ও আবু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম রহ. বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা যারাকশী রহ. হাদীসটির সব বর্ণনাধারা ও সনদ তুলে ধরার পর বলেন, মনে রাখ! এ হাদীসের বর্ণনাধারা ও সনদ একাধিক রয়েছে, যার কোনটিই প্রশ্নাতীত নয়। তবে আমি একাধিক সনদ এখানে নিয়ে এসেছি যাতে এক সনদ অপর সনদকে শক্তিশালী করে। এ ছাড়াও হাদীসের সাক্ষ্য হল, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا - أَوْ قَالَ: غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ، قَالَ: «شَهَادَةُ القَوْمِ المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ» "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, লোকেরা তারা ভালো প্রসংশা করল, তাদের প্রসংশা শোনে আল্লাহর রাসূল বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর অপর একটি জানাযা অতিক্রম করল, লোকের দূর্নাম করল। তাদের কথা শোনে রাসূল্লাল্লাহু সা. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন এর জন্য বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে আবার এর জন্যেও বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে? এ হল, কাওমের লোকদের সাক্ষ্য। মু'মিনরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। (বুখারী হাদীসন নং ২৬৪২) সহীহ মুসলিমে এ শব্দে বর্ণিত, «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» "তোমরা যার ভালো প্রসংশা করছ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর তোমরা যার খারাপ প্রসংশা করছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। জমিনে তোমরা আল্লাহর সাক্ষ্য। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪৯) এ কথা তিনবার বললেন। দেখুন –ইমাম বদরুদ্দীন আয-যারাকশী রহ. এর আমু'তাবার, পৃষ্ঠা: (৬২-৭২)

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত ওপর ভুল অসম্ভব হওয়া বিষয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত তারা অবশ্যই নিষ্পাপ উম্মত। কুরআন দ্বারা প্রমাণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ١٤٣﴾ [البقرة: ١٤٣] "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ١٠٣﴾ [ال عمران: ١٠٣] "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

আর সুন্নাহের প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মত কখনো ভুলের ওপর একমত হবে না। এ উম্মত ভুল থেকে নিরাপদ হওয়া বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক বর্ণনা বিভিন্ন শব্দে একই অর্থে বা সামর্থক বর্ণিত হয়েছে এবং নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য সাহাবীগণ যেমন, 'উরওয়াহ ইবন মাসউদ, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবন মালেক, ইবন উমার, আবু হুরাইরা ও হুযাইফাহ ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখদের জবানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর মতো বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না। আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর একত্র করবে না। তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহ তা 'আলার নিকট চেয়েছি, যাতে তিনি আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর একমত না করেন। তিনি আমাকে তা দিয়েছেন। যাকে এ বিষয়টি খুশি করে যে, সে জান্নাতের উচ্চ স্থানে বসবাস করতে সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে। কারণ, তাদের দো'আ বেষ্টন করে রাখে যারা তাদের পিছনে রয়েছে তাদেরক। শয়তান একা লোকের সাথে থাকে। আর দুইজন লোক থেকে সে অনেক দূরে। আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের ওপর। আল্লাহ তা'আলা যে বিচ্ছিন্ন হয় তার বিচ্ছিন্নতাকে পরওয়াহ করেন না।

তিনি আরো বলেন, «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» আমরা উম্মত কখনো গোমরাহী ওপর একত্র হবে না। যখন তোমরা তাদের মধ্যে বিভক্তি দেখ, তবে তোমরা বড় জামা'আত (যারা হকের ওপর আছে) তাদের সাথে থাক। (ইবন মাজাহ , হাদীস নং ৩৯৫০) তিনি আরো বলেন, «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» "আমার উম্মতের একটি জামা'আত সর্বদা বিজয়ী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হকের ওপর থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। এ ধরনের হাদীসসমূহ সাহাবী ও তাবে'ঈদের থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত

এ কারণেই এ উম্মতের হক পন্থীগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত নামে বিশেষিত হয়েছে বাতিলপন্থীদের থেকে, যারা নিজেদেরকে আল-কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করত এবং তারা হাদীস গ্রহণ করা থেকে এবং যার ওপর মুসলিম জামা‘আত প্রতিষ্ঠিত ছিল তা থেকে বিরত থাকত। অথচ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা‘আত বদ্ধ থাকতে এবং ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠﴾ [النساء : ٨٠]

“যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করল সে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করল আর যে ফিরে গেল, তাদের ওপর আপনাকে রক্ষক বানিয়ে পাঠাই নি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ٦٤﴾ [النساء : ٦٤]

হয়ে আসছে, উম্মাতের পূর্বসূরি ও পরবর্তীদের থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের কেউ এ হাদীসগুলোর কোনো প্রতিবাদ করেন নি। সুতরাং হাদীসগুলো উম্মতের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য। এ হাদীসগুলো দ্বারা তারা সবসময় দ্বীনের মৌলিক ও বিধি-বিধান বিষয়ে দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের অবস্থানকে খুব গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন এবং তিনি উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে এ কথার জানান দেন যে, এ উম্মত ভুল থেকে নিরাপদ। সামগ্রিকভাবে উম্মতের এ ধরনের নিষ্পাপ হওয়া তাদের মতৈক্যকে শর‘ঈ প্রমাণ হওয়াকে সাব্যস্ত করে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন যে, তোমরা নিরাপদ জামা‘আতের সাথে থাক। দেখুন, আল-মুসতাছফা, ১৭৫-১৭৬/১।

“আর আমরা রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তার আনুগত্য করা হয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [ال عمران: ٣١]

“আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর, ফলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“অতএব, তোমার ‘রব এর শপথ! তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক নিযুক্ত না করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ١٠٣﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমরা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ١٥٩﴾ [الانعام: ١٥٩]

“নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোনো কাজের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করত সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দেবেন”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ ۝١٠٥﴾ [ال عمران: ١٠٥]

“আর তাদের মতো হইয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ۝٤﴾ [البينة: ٤]

“যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর”। [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥﴾ [البينة: ٥]

“তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তার ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দীন”। [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝١٥٣﴾ [الانعام: ١٥٣]

“আর এটাই আমার সরল সঠিক পথ, এ পথেরই তোমরা অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে

বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফাতিহায় বলেন,

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]

“আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি নি‘আমত দান করেছেন; তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে”। [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৬-৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন,

«الْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارى ضَالُّوْن»

“ইয়াহুদীরা হলো যাদের ওপর গযব বর্ষিত হয়েছে এবং খ্রিস্টানরা হলো যারা পথভ্রষ্ট”।[13]

সূরা ফাতিহা যাকে উম্মুল কিতাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যে সূরাটি তাওরাত, যবুর ইঞ্জিলসহ কুরআনের অন্য কোথাও এ ধরনের সূরা নাযিল করা হয় নি, যে সূরাটি আমাদের নবী মুহাম্মাদকে আরশের নিচের ধন-ভাণ্ডার থেকে উপহার দেওয়া হয়েছে, যে সূরাটি পাঠ করা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয়

---

[13] ইমাম আহমদ রহ. ‘আদী ইবন হাতের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, তিনি বলেন, তারপর আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তারপর দেখলাম তার চেহারা উজ্জল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, “ইয়াহুদীরা হলো যাদের উপর গযব বর্ষিত হয়েছে এবং খ্রিস্টানরা হলো যারা পথভ্রষ্ট”। (আহমদ, ৩৭৮/৪; তিরমিযী, ২৮৬/৭)

না, সে সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন এ সূরার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াতের ঐ সরল পথ প্রার্থনা করি, যে পথকে আল্লাহ তা'আলা নি'আমত হিসেবে দান করেছেন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের। এটি ইয়াহূদীদের ন্যায় গযব প্রাপ্ত ও খ্রিস্টানদের ন্যায় পথভ্রষ্টদের পথ নয়।

এ সরল পথই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নির্ভেজাল দীন তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ। কেননা নির্ভেজাল সুন্নাহই হলো খাঁটি দ্বীন ইসলাম।[14] এ পথ যারা অনুসরণ করবে, তাদের বলা হবে, আহলে সূন্নাত ওয়াল জামা'আত। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বহু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সুনান ও মাসানীদ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سَتَفْتَرِقُ هذِهِ الأُمَّةُ عَلى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَـةً كُلُّهَا فِيْ النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً ألاَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

[14] এমন সোজা ও সঠিক রাস্তা যে রাস্তায় চলাচল করা দ্বার একজন পথিক দ্রূত তার গন্তব্যে পৌছতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে একাধিক স্থানে সিরাত শব্দটি উল্লেখ করেছেন। শয়তানের পথকে কোথাও সিরাত বলেননি বরং তার পথকে সুবুল বলেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,
মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর তিনি বলেন, এটি আল্লাহর রাস্তা তারপর ডানে ও বামে আরও কিছু রেখা টানেন এবং বলেন, এগুলো রাস্তা প্রতিটি রয়েছে একজন করে শয়তান যারা মানুষকে তাদের দিকে ডাকেন। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় তাদের আগুনে নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। আহমাদ, হাদীস।

“অতিশীঘ্রই এ উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জেনে রেখ ঐ একটি হলো, প্রকৃত জামা‘আত”।

অন্য বর্ণনায় ঐ জামা‘আত এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এভাবে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَـا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ»

“তারা হলো আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তার ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারা।[15]

---

[15] হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত, আবু দাউদ (৩-৪/৭) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মু‘আবিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী, (৩৯৭/৭) কিতাবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯১। জামা‘আত যাদের সাথে থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন তাদের বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। সাতবী রহ. এ সব মতামতকে সাতটি কথায় একত্রে নিয়ে এসেছেন-

এক- ইসলাম পন্থীদের বড় জামা‘আত।

দুই- মুজতাহেদ ও আলেমদের জামা‘আত।

তিন- বিশেষ করে সাহাবীগণের জামা‘আত। কারণ, তারাই দীনের খুটিকে দাড় করিয়েছেন এবং পেরাগ মেরেছেন। তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, তারা কখনো গোমরাহীর ওপর একমত হতে পারে না, যদিও অন্যদের ব্যাপারে এ সম্ভাবনা রয়েছে। এর সমর্থন নাজাত প্রাপ্ত দল সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,......

চার- জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলিমদের জামা‘আত। যখন তারা কোন বিষয়ে একমত হয় তখন ওপর ওয়াজিব হল তারা তাদের অনুকরণ করবে।

পাঁচ- মুসলিমদের জামা‘আত যখন তারা কোন আমীরের নেতৃত্বে একত্র হয়। (আল-ই‘তিছাম: ২৬০-২৬৫/২)

মোটকথা: জামা‘আত দ্বারা কী অর্থ সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, জামা‘আত হল, ঐ দল যাদের নাজাতপ্রাপ্ত বলে রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, ...আর ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

(মুক্তিপ্রাপ্ত দলের দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে):

খ- আল-ওয়াসাতিয়্যাহ: (মধ্যপন্থী হওয়া)

এ নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত দল, যারা ‘আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত’ নামে পরিচিত। তারা হলেন সকল দলসমূহের মধ্যে মধ্যপন্থী। যেমন, সমগ্র ধর্ম তথা জীবন ব্যবস্থার মধ্যে ইসলাম হলো মধ্যপন্থী দীন।

- সুতরাং মুসলিমগণ হলেন আল্লাহ তা‘আলার নবী, রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাদের মধ্যে মধ্যপন্থী। তারা তাদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে না, যেমন খ্রিস্টানগণ সীমালঙ্ঘন করেছিল। খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে, তাদের যারা আলেম ও পাদ্রী তাদের উপাস্য সাব্যস্ত করে এবং মাসীহ ইবন মারইয়ামকে তারা (উপাস্য) সাব্যস্ত করে। অথচ তাদের আদেশ দেওয়া

সুন্নাতের অনুকরণ ও তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন তার অনুকরনের ওপর। আমর ইবন মাইমুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু‘আয ইবন জাবাল রাসূলের যুগে আমাদের নিকট আগমন করেন। তাকে দেখে আমার অন্তরে তার ভালোবাসা গভীর হয়। যতদিন সে বেচে ছিল সিরিয়ার মাটিতে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তার সাথেই ছিলাম। তারপর এ উম্মতের সবচেয়ে বড় ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গ অবলম্বন করি। একদিন তার নিকট সালাতকে সময়ের বাইরে নিয়ে দেরী করার বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা তোমাদের ঘরে আদায় করে নিবে, তারপর তাদের সাথে জামাতে যা পড়বে তা তোমাদের জন্য নফল হিসেবে বিবেচিত হবে। আমর ইবন মাইমুন বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকে বলা হলো ‘জামা‘আত’ (কে আঁকড়ে ধরার কথা আপনি বলে থাকেন, আবার একাকী সালাত আদায় করতে বলেন, তাহলে জামা‘আতে) আমাদের করনীয় কি? তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আমর ইবন মাইমুন লোকজনের সংখ্যা বেশি হওয়াই বিছিন্নতা। জামা‘আত হলো যারা আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নেয় যদিও তুমি একা হও। (দেখুন: মাজমু‘আয়ে ফাতওয়া: ১৭৯/৩)

হয়েছিল যে, তারা যেন এক ইলাহের ইবাদাত করে, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা তার সাথে যাদের শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র।[16] মুসলিম জামা'আত নবীদের প্রতি এ ধরনের কোনো অবিচার ও জুলুম অত্যাচার করেনি যেমনটি করেছে ইয়াহূদীরা। তারা বহু নবীদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছে। মানব সমাজে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিতেন তাদেরকেও তারা হত্যা করেছিল।[17] তাদের প্রবৃত্তি ও মতের বিরুদ্ধে যখনই

---

[16] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَه عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ [التوبة: ৩১] "তারা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহ্কে রব বানিয়ে নিয়েছে অথচ তাদের প্রতি এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি তাদের অংশীদার স্থির করা হতে পবিত্র"।[16]

[17] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبۡلٖ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ١١٢﴾ [ال عمران: ١١٢] "তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের ওপর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি থাকলে আলাদা কথা। আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নিয়ে ফিরে এসেছে। আর তাদের উপর দারিদ্র্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তা এ জন্য যে, তারা নাফরমানী করেছে, আর তারা সীমালঙ্ঘন করত"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَيَقۡتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡقِسۡطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢١﴾ [ال عمران: ٢١] "নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে, আর মানুষের মধ্য থেকে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২১]

কোনো রাসূল আসতেন, তখন তাদের একদল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত ও অপর দল তাদেরকে হত্যা করত।[18]

পক্ষান্তরে মুমিন মুসলিমরা কখনোই এ ধরনের কাজ করতে পারে না, তারা আল্লাহ তা'আলার নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেন, তাদের সম্মান করেন, ভালোবাসেন ও তাদের আনুগত্য করেন। তারা তাদের ইবাদাত করেন না এবং তাদেরকে রব হিসাবে মেনেও নেন না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কতই সুন্দর বলেছেন,

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن كُونُوا۟ رَبَّـٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۝٧٩ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝٨٠﴾ [ال عمران: ٧٩، ٨٠]

"এটা কোনো মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওয়ত দান করেন, অতঃপর সে মানবমণ্ডলীর মধ্যে এ কথা বলে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে পরিত্যাগ করে আমার ইবাদাত কর, বরং বলবে তোমরা হয়ে যাও 'রাব্বানী' (কাণ্ডারী), কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষাদান কর এবং ওটা নিজেরাও পাঠ করে থাক। আর তিনি আদেশ করেন

---

[18] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝٨٧﴾ [البقرة: ٨٧] "আর আমরা নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি 'পবিত্র আত্মা'র মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৭]

না যে, তোমরা ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরি করার আদেশ করবেন”? [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৯-৮০]

- অনুরূপভাবে মুমিনগণ ঈসা আলাইহিস সালাম বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা খ্রিস্টানদের মতো বলে না যে, ঈসা-ই আল্লাহ, তার পুত্র অথবা তিন জনের একজন। আর তারা তাকে অস্বীকারও করে না এবং মারইয়াম আলাইহিস সালামের প্রতি গুরুতর অপবাদও আরোপ করে না। যেমন, ইয়াহূদীগণ অপবাদ দিয়ে থাকে। ইয়াহূদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। বরং মুমিনগণ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম বান্দা ও তার শীর্ষস্থানীয় একজন রাসূল, তিনি আল্লাহর কালিমা, যাকে পবিত্রা কুমারী নারী মারিয়ামের পেটে ঢেলে দেওয়া হয় এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত (সৃষ্ট) এক রূহ।
- অনুরূপভাবে মুমিনগণ আল্লাহ তা‘আলার দীনের বিধি-বিধানের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা মনে করেন আইন প্রণয়ন করা, রহিত করা ও বহাল রাখার একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তা‘আলা। আল্লাহ তা‘আলা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কিছু রহিত করতে চাইলে এবং কোন বিধান বহাল রাখতে চাইলে তারা তার ওপর এসব বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না। (আল্লাহ যা ইচ্ছা রহিত করেন, আবার যা ইচ্ছা তিনি বহাল রাখেন।) যেমনটি ইয়াহূদীরা বলে থাকেন। (তারা আল্লাহর দ্বারা কোনো বিধান রহিত করার অধিকার নেই বলে থাকে) আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ ١٤٢﴾ [البقرة: ١٤٢]

“মানুষের মধ্যে নির্বোধগণ বলে যে, তারা যে কিবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ ٩١﴾ [البقرة: ٩١]

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তা‘আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন। তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপর ঈমান আনি যা আমাদের বনী ইসরাঈল জাতির ওপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাহিরে যা আছে তা তারা অস্বীকার করে (অথচ] তা একান্ত সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়ণকারী”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯১]

আর মুসলিমগণ তাদের বিজ্ঞ আলিমদের ও বুজর্গানে দীনদের জন্যে এটা জায়েয মনে করেন না যে, তারা চাইলে আল্লাহ তা‘আলার দীনকে পরিবর্তন করবে। যা ইচ্ছে তা শরী‘আত বলে নির্দেশ দিবেন এবং যা ইচ্ছে তা হারাম বলে নিষেধ করবেন যেমনটি করে থাকে খ্রিস্টানগণ। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١]

“এসব লোকেরা আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

এ আয়াতটির ওপর আদী ইবন হাতীম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ তা‘আলার রাসূল! তারা তো তাদের ইবাদাত করে না। আল্লাহ তা‘আলার রাসূল প্রত্যুত্তরে তাকে বলেছিলেন,

«مَا عَبَدُوْهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوْهُمْ وَحَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوْهُمْ»

“তারা ইবাদাত করে না ঠিকই, তাদের আলেমরা হারামকে হালাল বলেন। আর তারা তাদের অনুকরণ করে ও মেনে নেয়। আর হারামকে হালাল বলেন আর তারা তাদের অনুকরণ করে ও মেনে নেয়।” সে বলল হ্যাঁ। আল্লাহ তা‘আলার রাসূল তাকে বললেন, তাহলে এটাই তো তাদের ইবাদাত করা হলো। কেননা হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা তো তার, যিনি রব।[19]

পক্ষান্তরে, মুমিনদের বক্তব্য হল, সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল আল্লাহর জন্য। যেমন করে কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তেমনি অপরকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে না। আর মুমিনগণ বলেন, আমাদের কথা হবে আমরা শুনলাম ও মানলাম। ফলে তারা আল্লাহ তা‘আলা যা আদেশ করেছেন, তা তারা মেনে নিয়েছেন। আর তারা বলে,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١ ﴾ [المائدة: ١]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যা চান তার আদেশ দেন”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১]

পক্ষান্তরে মাখলুক স্রষ্টার কোনো নির্দেশের পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না, সে যদিও মহা ক্ষমতাশালী হয়।

• অনুরূপ মুমিনগণ আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী বিষয়ে মধ্যপন্থী। কেননা, ইয়াহূদীরা আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলীকে অপূর্ণাঙ্গ মাখলুকের গুণাবলীর সাথে

[19] ‘আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস একাংশ। ইমাম তিরমিযী তাফসীর অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ “তবে তারা তাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেননি, তারা যখন কোন কিছুকে হালাল বলত, তারাও তাকে হালাল মনে করত। আর যখন কোন কিছুকে হারাম বলত, তারা তাকেও হারাম মনে করত”। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি গারীব। আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

বিশেষিত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তা‘আলা গরীব আর আমরা ধনী।[20] আল্লাহ তা‘আলার হাত বন্ধ।[21] তারা আরো বলে, তিনি সৃষ্টি করতে করতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি শনিবারের বিশ্রাম ও প্রশান্তি গ্রহণ করেছেন। এরূপ বহু ভ্রান্ত আকীদা ইয়াহূদীরা পোষণ করে থাকে।

আর খ্রিস্টানগণ মাখলুক তথা সৃষ্ট জীবকে স্বয়ং স্রষ্টার সাথে খাস এ ধরনের গুণাবলীর সাথে বিশেষিত করেছে। তারা বলে, মাখলুক সৃষ্টি করে, রিযিক দেয়, সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া করে, ক্ষমা করে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, প্রতিদান দিয়ে থাকে, শাস্তি প্রদান করে। (অথচ এগুলো কেবল স্রষ্টার গুণ)

মুমিনগণ আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনে যার কোনো শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তার কোনো উদাহরণও নেই; তিনিই সমগ্র পৃথিবীর রব, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া বাকী সবাই তার বান্দা এবং তার মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣ لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا ٩٤ وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ٩٥﴾ [مريم: ٩٣، ٩٥]

---

[20] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿لَّقَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٞ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُۘ سَنَكۡتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ١٨١﴾ [ال عمران: ١٨١] “নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী’। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব, ‘তোমরা উত্তপ্ত আযাব আস্বাদন কর”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮১]

[21] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾ [المائدة: ٦٤] “আর ইয়াহূদীরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা’। তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা‘নতগ্রস্ত হয়েছে। বরং তার দু’হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত নং ৬৪]

“আকাশ আর জমিনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দা হয়ে হাযির হবে না। তিনি (তার সৃষ্টির] সব কিছুকেই (কড়ায় গণ্ডায়] গুনে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এদের সবাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার সামনে আসবে”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৩-৯৫]

- অনুরূপভাবে হালাল ও হারামের ব্যাপারে মুমিনগণ মধ্যপন্থী। কিন্তু ইয়াহূদীরা তার বিপরীত, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের কতক বস্তুকে হারাম করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿فَبِظُلۡمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠﴾ [النساء : ١٦٠]

“ইয়াহূদীদের বাড়াবাড়ি আর বহু লোককে আল্লাহ তা‘আলার পথে বাধা দেওয়ার কারণে আমরা তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬০][22]

---

[22] ইবন কাসীর রহ. বলেন, ইয়াহুদীদের বড় বড় গুনাহের কারণে তাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু ইতিঃপূর্বে হালাল ছিল তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তাওরাতে যেসব বস্তু ইতিঃপূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ ٩٣﴾ [ال عمران: ٩٣] “সকল খাবার বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। তবে ইসরাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৩] তারপর আল্লাহ তাওরাতে অনেক কিছুকে তাদের ওপর হারাম করে দেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦﴾ [الانعام: ١٤٦] “আর ইয়াহূদীদের ওপর আমরা নখবিশিষ্ট সব জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের উপরে হারাম করেছিলাম, তবে যা এগুলোর পিঠে ও ভুঁড়িতে থাকে, কিংবা যা কোনো হাড়ের সাথে লেগে থাকে, তা ছাড়া। এটি তাদেরকে প্রতিফল দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

ইয়াহূদীরা নখ বিশিষ্ট প্রাণীর গোশত খেত না। যেমন, উট, হাঁস ইত্যাদি। পাকস্থলীর ঝিল্লির চর্বি, দুই কিডনির গোশত ও বকরীর দুধ প্রভৃতি তারা খেত না, যা তারা তাদের নিজেদের ওপর বিভিন্ন খাদ্য ও পোশাক ইত্যাদি হারাম করেছিল। এমনকি বলা হয়ে থাকে (খাদ্য, পোশাক ছাড়াও) তাদের ওপর তিনশত ষাট ধরণের বস্তু হারাম ছিল। দুইশত আটচল্লিশটি বিষয় তাদের ওপর ছিল কঠোর বিধান। অনুরূপভাবে নাপাকীর বিষয়ে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলার সঙ্গে তারা খানা-পিনা খেত না এবং একসঙ্গে এক ঘরে বসবাস করতো না।

প্রক্ষান্তরে খ্রিস্টানগণ যাবতীয় অপবিত্র জিনিস ও সমস্ত হারাম দ্রব্য হালাল করে নিয়েছিল। সকল প্রকার নোংরা অপবিত্র জিনিসের অনুশীলন করেছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের শুধু এ কথা বলেছিলেন, যার বর্ণনায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ ۝٥٠﴾ [ال عمران: ٥٠]

“আর যাতে আমি হালাল করি, কতক এমন বস্তু যা তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছিল”। [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৫০]

এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪৬] অর্থাৎ, আমি এসব বস্তু তাদের ওপর হারাম করেছি, কারণ, তারা তাদের অপকর্ম, হৎকারীতা, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের বিরোধিতা করার কারণে এ ধরনের শাস্তি প্রাপ্য ছিল। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ۝١٦٠﴾ [النساء : ١٦٠] “ইয়াহূদীদের বাড়াবাড়ি আর বহু লোককে আল্লাহ তা‘আলার পথে বাধা দেওয়ার কারণে আমরা তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬] তাফসীরে ইবন কাসীর: ৫৮৫/১

﴿قَاتِلُواْ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ﴾

[التوبة:]

“যে সব আহলে কিতাব আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনে না, আর কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল হারাম করেছেন, আর সত্য দীনকে নিজেদের দীন (ইসলাম) হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া (কর) দেয়”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯]

পক্ষান্তরে মুমিনগণ- যেমন, আল্লাহ তা‘আলা তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তারা স্বীয় বাণীতে, তিনি বলেন,

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ ١٥٦ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧﴾ [الاعراف: ١٥٥، ١٥٦]

“আর আমার দয়া (রহমত) তো (আসমান-জমিনের) সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তা‘আলা তা‘আলাকে ভয় (তাকওয়া অবলম্বন করে) করে, যারা যাকাত আদায় করে, যারা আমার আয়াত সমূহের ওপর ঈমান আনে। যারা এ বার্তাবাহক উম্মী (নিরক্ষর) রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার উল্লেখ তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়। যে নবী তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ

হালাল করে ও অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করেন, তাদের ঘাড়ে যে বোঝা ছিল তা তিনি নামিয়ে দেন এবং যে সব বন্ধন তাদের গলার ওপর ছিল তা তিনি খুলে ফেলেন। অতএব, যারা তার ওপর ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আর তার ওপর অবতীর্ণ আলোর (কুরআন) অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬-১৫৭]

এ প্রসঙ্গে তাদের আরো বহু গুণাবলী রয়েছে, যা বর্ণনা করতে গেলে অধ্যায়টি অনেক দীর্ঘ হবে।

অনুরূপভাবে দলসমূহের মধ্যেও **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত মধ্যপন্থী দল:**

দলসমূহের মধ্যেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত মধ্য পন্থী দল:

- মুমিনগণ আল্লাহর নাম সিফাত ও আয়াতসমূহের বিষয়েও মধ্যপন্থী। তারা আহলে তা‘তিল তথা নির্গুণবাদী, যারা যারা আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহকে অর্থহীন করে, আর স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তারা তাকে অকার্যকর বলে আখ্যায়িত করে।[23] এমনকি তারা একগুলোকে অস্তিত্বহীন ও মৃতের সাথে তুলনা করে। মুমিনগণ তাদের (এই আহলে তা‘তীল) ও আহলে তামসীল[24] তথা স্বাদৃশ্যবাদীদের মধ্যে মাঝামাঝি

---

[23] মু‘আত্তিলাহ: ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সিফাতগুলো তার সত্বার সাথে থাকার কথাকে মানে না। আল্লাহর যে সব গুণ তার স্বয়ং সম্পন্নতা ও কামালিয়াতের ওপর প্রমাণ, তারা তা আল্লাহ থেকে অস্বীকার করে। সর্বপ্রথম ইসলামে এ ভ্রান্ত আকীদা যিনি চালু করেন, তার নাম জা‘আদ ইবন দিরহাম। আর তার থেকে এ বিষয়গুলো গ্রহণ করে তার ছাত্র জাহাম ইবন সাফওয়ান।

[24] এর অর্থ সাদৃস্য স্থাপন করা। যেমন, একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর সাথে তুলনা করা। উভয় বস্তুকে সমান মনে করা, কোন বস্তুকে অপর বস্তুর মতো করে তৈরি করা। সুতরাং আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী কখনো মাখলুকের সিফাত বা গুণাবলীর সাদৃশ্য হতে পারে

অবস্থানে। এ আহলে তামসীল অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ও তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ বর্ণনা করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলাকে সাদৃশ্য স্থাপন করে।[25]) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী তেমনি যেমন তিনি তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার গুণাগুণ করেছেন; কোনো প্রকার তাহরীফ (বিকৃতি), অস্বীকার, তাকয়ীফ[26] (ধরণ) বর্ণনা করা ও উদাহরণ উপস্থাপন করা ছাড়া।

না। কারণ, আল্লাহর সত্বা, সিফাত, নামসমূহ এবং কর্মে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই, তার কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তার কোনো তুলনা নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١] তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

সাদৃশ্য স্থাপন করা দুই প্রকার:

এক- সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করা। যেমন, খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে এবং উযাইর আলাইহিস সালামকে এবং মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে।

দুই- স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন, সাদৃশবাদীরা বলে, আল্লাহর আমাদের হাতের মতো হাত রয়েছে আর আমাদের কানের মতো কান রয়েছে। আর বস্তুত সব সাদৃশবাদীরাই মু'আত্তিলা বা নির্গুণবাদী।

[25] অনুবাদক

[26] তাকয়ীফ: কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট ধরণ বর্ণনা করা বা ধরণ সাব্যস্ত করাকে তাকয়ীফ বলা হয়। কোনো বস্তুর ধরণ হলো, তার অবস্থা বা তার গুণাগুণ নির্ধারণ। আর আল্লাহর অবস্থা বা ধরণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তার স্বীয় ইলমে সংরক্ষণ করেছেন। এ বিষয়গুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। কোনো মাখলুকের জন্য সে সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, গুণ সব সময় সত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। সত্বার ধরণকেই যদি জানার সুযোগ না থাকে তাহলে তার সিফাতের ধরণ কীভাবে জানা সম্ভব হবে?। ইমাম

- অনুরূপভাবে মুমিনগণ 'আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশ' অধ্যায়েও মধ্যপন্থী। তারা আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়্যা; যারা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, তার সার্বজনীন ইচ্ছা এবং তিনি যে সব কিছুর স্রষ্টা তার ওপর ঈমান রাখে না, অথচ তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। মুমিনগণ সে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় ও জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থানে, কারণ এ জাবরিয়্যা সম্প্রদায় বলে, বান্দার কোনো কিছু করার ইচ্ছাশক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, কোনো কর্ম নেই। তাই তারা, আল্লাহ তা'আলার আদেশ, নিষেধ, সওয়াব ও শাস্তির সকল বিধান বাতিল ও অকার্যকর মনে করে। ফলে তারা ঐসব মুশরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন তবে আমরা শির্ক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করত না, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতাম না । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ ١٤٨﴾ [الانعام: ١٤٨]

"যারা শির্ক করে তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন তবে আমরা শির্ক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করত না, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতাম না"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪৮]

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি বান্দাদের হিদায়াত দেওয়ার করার ক্ষমতা রাখেন এবং তাদের হৃদয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি আল্লাহ যা

মালেক রহ.কে ইস্তেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইস্তেওয়া ধরণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, ইস্তেওয়া অবশ্যই প্রমাণিত ও তার অর্থ বিদিত, কিন্তু তার ধরণ অজ্ঞাত, এর ওপর বিশ্বাস ওয়াজিব এবং এর ধরণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা বিদ'আত।

চান তা হয়, আর যা তিনি চান না, তা হয় না। তার রাজত্বে এমন কিছু সংঘটিত হয় না যার ইচ্ছা তিনি করেন নি। তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে তিনি অপারগ বা অক্ষম নন। তিনি বস্তুনিচয়, গুণাগুণ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা।

আর তারা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, বান্দার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কর্ম রয়েছে। সে ইচ্ছে মাফিক কাজ করতে পারে। তারা তাদেরকে বাধ্য বলে বিশ্বাস করে না। কারণ, বাধ্য বলা হয়, যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার কর্মে স্বাধীন বানিয়েছেন। সুতরাং সে স্বাধীন, ইচ্ছাকারী। আল্লাহ তা'আলা যেমনি তার স্রষ্টা, তেমনি তার এখতিয়ার-স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিরও স্রষ্টা। এ ক্ষমতায় আল্লাহর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'আলা এমন এক মহান সত্ত্বা, যার সত্ত্বা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে তার কোনো তুলনা নেই।

- অনুরূপভাবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নাম-ধাম প্রদান করা (মুমিন-কাফির বলা), বিধি-বিধান, ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ও ধমকী (হুমকি)র বিষয়েও মধ্যপন্থী। তারা চরমপন্থী তথা খারেজী, যারা মুসলিমদের মধ্যে কবীরাগুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আজীবন জাহান্নামী মনে করে, তাদের ঈমান থেকে সম্পূর্ণ খারিজ-বহিস্কার মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশকে অস্বীকার করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা মুমিনগণ সে খারেজী সম্প্রদায় ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাঝামাঝি অবস্থানে। এ মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে, পাপীদের ঈমান আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের ঈমানের সমতুল্য। নেক আমল দীন ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তিমূলক সতর্কবাণী ও শাস্তি প্রদানকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, পাপিষ্ঠ মুসলিমের মূল ঈমান সহ আংশিক ঈমান বিদ্যমান থাকে। তারা পূর্ণাঙ্গ মুমিন নন। তাদের সাথে এমন পরিপূর্ণ ঈমান নেই যদ্বারা তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হবে। তবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং যার হৃদয়ে শস্যদানা ও সরিষার দানা সমতুল্য ঈমান আছে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্যে সাফা'আত সংরক্ষণ করেছেন।

- অনুরূপভাবে মুমিনগণ, রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী দলেরও মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছেন। কারণ সীমা লঙ্ঘনকারীরা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উক্ত দু'জন ব্যতীত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-ই একমাত্র নিষ্পাপ ইমাম। তারা বলে থাকে যে, সাহাবীগণ যুলুম-অত্যাচার ও পাপ কর্ম করেছেন। তারা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহকে কাফির বলে থাকে। কখনো কখনো তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী ও ইলাহ বানিয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতগণ সেই গালিয়া তথা শিয়া-রাফেযী সম্প্রদায় ও জাফিয়া তথা অসম্মানকারী সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থানে। জাফিয়া-অত্যাচারী দল, তারাই যারা এ আক্বীদা রাখে যে আলী ও উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয়-ই কাফির। তারা তাদেরকে ও তাদেরকে যারা ক্ষমতাসীন করেছেন তাদের রক্ত হালাল মনে করে। তাদেরকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করে। তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফত ও ইমামত বিষয়ে অপবাদ দেয়, দুর্নাম ও গালি-গালাজ করে।

- অনুরূপভাবে মুমিনগণ ‘সুন্নত অধ্যায়’ এর সকল বিষয়ে মধ্যপন্থী। কারণ, তারা আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে যথাযথ আঁকড়ে ধারণকারী। আর তারা পূর্ববর্তী-অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের অনুসরণকারীগণ যে আদর্শের ওপর ছিলেন তারই ধারণকারী।

অনুচ্ছেদ

মনে জাগরুক করা ও স্মরণ করা:

হে পাঠক মণ্ডলী! আপনারা, আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে সংশোধন করুন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আপনাদেরকে তাঁর দীনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক, যার ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে তাদের যে পরীক্ষার সম্মূখীন হতে হয়েছে তা থেকে আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে রক্ষা করেছেন। নি‘আমতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ও মহান নি‘আমত হলো ইসলাম। তাই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন তথা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন (জীবন ব্যবস্থা) অনুসন্ধান করবে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে সুন্নতের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত করে রাফেদ্বী[27],

---

[27] রাফেদ্বী সম্প্রদায়ের নামকরণের মূল হচ্ছে, যায়েদ ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবী তালেব হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার পর যায়েদের অনুসারীদের কেউ কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অপবাদ ও গাল দেয়। তখন তিনি তাদের নিষেধ করেন। তারা শুনলো না বরং তার সঙ্গ ত্যাগ করল। তার সাথে কেবল একশত অস্বারোহী ছিল। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা আমাকে ‘রফদ্ব’ করলে অর্থাৎ ছেড়ে দিলে? তারা বলল, হাঁ, তারপর থেকে তাদের রাফেদ্বী বলা হতো। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের রাফেদ্বী বলার কারণ, তারা যায়েদ ইবন আলীকে ছেড়ে চলে

জাহমিয়া[28], খারেজী[29] ও কাদারিয়্যাদের[30] মতো বহু বিদ‘আতপন্থী পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যাদের অনেকেই আপনাদের সামনেই আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ, গুণাবলী, তারা ফায়সালা ও তাকদীর নির্ধারণকে অস্বীকার করেছে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গাল দিয়েছে। যাকে আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম নামক নি‘আমত

যায়। তারা আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি তাদের প্রসংশা করেন এবং বলেন, আমি আমার পিতাকে তাদের বিষয়ে ভালো ছাড়া কোন খারাপ মন্তব্য করতে দেখিনি। তারা দুই আমার দাদার দুই বাহু ছিলেন সুতরাং আমি তাদের থেকে দায় মুক্তি ঘোষণা দিতে পারবো না। তার কথা শোনে তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং প্রত্যাখ্যান করল এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তাদের বললেন, তোমরা আমাকে ‘রফদ্ব’ করলে বা ছেড়ে দিলে। সে সময় থেকে তাদেরকে ‘রাফেদ্বী’ বলা হয়। তারপর নামটি শিয়াদের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

[28] জাহাম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী। তারা বলে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা তাতে প্রবেশ করার পর জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তারা বলে ঈমান হলো, শুধু আল্লাহকে জানা আর কুফর হলো, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

[29] খারেজী যারা তাহকীম তথা শালিসের পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ ত্যাগ করেন। কারণ, তিনি তাহকীম কবুল করেন। অথচ তারাই তাকে তাহকীম মেনে নেওয়ার ওপর বাধ্য করেন। তারা বলেছিল, অপর পক্ষ আমাদের আল্লাহর কিতাবের দিক আহ্বান করছে আর তুমি আমাদের তলোয়ারের দিকে আহ্বান করছ? তারপর যখন আলী রা. তাদের কথা অনুযায়ী তাহকীম মেনে নেন, তখন তারা বলে, তুমি কাফের হয়ে গেছ। কারণ, তুমি মানুষকে বিচারক মানছ।

[30] কাদারিয়্যাহ: যারা কাদার তথা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের বলা হয় কাদারিয়্যাহ। তারা বলে, কোনো কদর তথা পূর্ব নির্ধারিত কিছু নাই, সব কর্ম নতুন। তারা আরো বিশ্বাস করে সব বান্দা তার কর্মে স্রষ্টা। তাদের কাদারিয়্যাহ এ জন্য বলা হয়, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাদরকে অস্বীকার করে এবং সবকিছু বান্দার পক্ষ থেকে হয় অর্থাৎ কাদরকে তারা বান্দার জন্য সাব্যস্ত করে। এদেরকে এ উম্মতের মুজূসী বলা হয়ে থাকে।

দ্বারা ধন্য করেছেন তার জন্য এটিই আল্লাহর তা'আলার নি'আমতরাজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমত। কারণ, এ ইসলামই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতা ও দীনের সম্পূর্ণতা। এ কারণেই আপনাদের মধ্যে বহু দুনিয়া বিমুখ দীনদার, পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী, যোদ্ধা ও মুজাহিদ রয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিদ'আতী গোষ্ঠিদের মধ্যে পাওয়া দূর্লভ।

সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলিম সৈন্য ও আল্লাহর বাহিনীর মধ্যে তোমাদের এমন সব লোক সব সময়েই রয়েছে যাদের কারো দ্বারা আল্লাহ এ দীনকে শক্তিশালী করেন এবং মুমিনদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়া বিমুখ ও ইবাদাতগার, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও আছে যার রয়েছে অনেক পাক-পবিত্র 'হাল' বা ভালো অবস্থা এবং সন্তোষজনক পন্থা। আর তার রয়েছে দূরদর্শিতা ও অসাধারণ প্রতিভা।

তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বন্ধু, যারা আল্লাহকে ভয় করত, দুনিয়াতে যাদের রয়েছে সততার সু-খ্যাতি। কারণ, পূর্বের মনীষীগণ যেমন, শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ইবন ইউসুফ আল-কুরাশী এবং তারপর বিশিষ্ট শেখ আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী এবং আরো যারা তাদের পথের পথিক, তাদের দীনদারী, সুন্নতের অনুসরণ ও তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের সম্মান কত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মর্তবাকে কত মহান করেছেন।

আর শাইখ ('আদী) ছিলেন আল্লাহর নেক বান্দা ও সুন্নাতের অনুসারী বড় বড় মাশায়েখ ও সম্মানী মনীষীদের অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী এবং উন্নত চরিত্র ও বৈশিষ্টের কেন্দ্রবিন্দু যা জ্ঞানী বলতে সবাই জানত। উম্মতের মধ্যে তার অবদান খুবই সু-প্রসিদ্ধ এবং তার সততা খুবই আলোচিত। আর তার থেকে যে আকীদা বা বিশ্বাস পাওয়া যায় তা তার

পূর্বের যে সব মাশায়েখদের পথের পথিক ছিলেন তাদের আকীদা বা বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ছিল না। যেমন বিশিষ্ট ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুল ওয়াহেদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-আনছারী আশ-শীরাযী, (দামেশকী) এবং শাইখুল ইসলাম (আল-হাক্কারী) ও আরো যারা তাদের উভয়ের মত। এ সব মাশাইখ (আকীদা ও আমলের) বড় বড় মূলনীতিসমূহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিসমূহ থেকে বের হন নি; বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিসমূহের প্রতি তাদের ছিল সযত্ন চলাচল ও আগ্রহ উদ্দীপনা এবং তা প্রচার প্রসার ঘটানোর প্রতি ছিল প্রকট আগ্রহ ও চাহিদা। আর যারা দীন, ফযল ও ভালো কাজের বিরোধিতা করত তাদের প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তারা ছিলেন উদগ্রীব। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে কতইনা বৃদ্ধি করেছেন। তারা তাদের বড়দের মূলনীতি সম্পর্কে শুধু বলত: ভালো, কোনো মন্তব্য করত না। অথচ তাদের কথা এবং তাদের মতো যারা রয়েছেন তাদের বিষয়ে এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, তাদের কথার মধ্যেও দুর্বল হাদীস, অগ্রণযোগ্য কথা-বার্তা ও বাতিল কিয়াস রয়েছে যা কেবল সুক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী জ্ঞানীরাই ধরতে পারেন।

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারও কথাই নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়, রাসূল ব্যতীত প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণীয়ও হতে পারে এবং বর্জনীয়ও হতে পারে। বিশেষ করে পরবর্তী যুগের অনেক মুসলিম যারা পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে নির্গত ফিকহের আলোকে সমাধান গ্রহণ করে নি। তারা সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসসমূহের মধ্যে পার্থক্যও করে নি। কিয়াস করার পরিণতি ও তার ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে তারা এত বেশি সতর্কও ছিল না। বস্তুতঃ এ সব কারণগুলোর সাথে সাথে আরো যোগ হয়েছিল, তাদের প্রবৃত্তি চর্চার প্রাধান্য, মানব রচিত মতাদর্শের আধিক্যতা, মতভেদ ও দলাদলির

প্রকট রূপ এবং শত্রুতা ও বিভক্তির বিভীষিকা। উল্লিখিত বিষয়াবলী ও এ জাতীয় কারণগুলো মানুষের মধ্যে দু'টো অন্যায় গুণের উদ্রেক করে। মানুষের মধ্যে যুলুম-অত্যাচার ও অজ্ঞতার শক্তিকে বৃদ্ধি করে। যে দু'টি গুণে মানুষ গুণান্বিত হওয়ার কথাটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। যাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

﴿وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الاحزاب : ٧٢]

"কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২]

যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি জ্ঞান ও ন্যায় দ্বারা ভূষিত করার মাধ্যমে দয়া করেন, তখন তিনি তাকে এ ধরনের গোমরাহী থেকে নাজাত দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ [العصر: ١، ٤]

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে"। [সূরা আল-আছর, আয়াত: ১-৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤﴾ [السجدة : ٢٤]

"আর আমরা তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল"। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২৪]

মুক্তির পথ:

আপনারা অবগত আছেন। 'আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সংশোধন ও সংস্কার করুন'। নিঃসন্দেহে আক্বীদার যাবতীয় বিষয়সমূহে, ইবাদাতের যাবতীয় বিষয়সমূহে ও সার্বিক জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুন্নতের অনুসরণ করা আবশ্যক এবং যে সুন্নতের অনুসারীগণ প্রশংসিত ও যে সুন্নাহর বিরোধীবাদীরা নিন্দিত, তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ জানার মাধ্যমে তা জানা যাবে, যা তার কর্তৃক কোনো কথা ও কর্ম সু-প্রমাণিত হবে বা কোনো কর্ম, কথা ও আমল যা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তা হতে জানা যাবে। অতঃপর পূর্বসূরীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরবর্তীগণ যারা একনিষ্ঠতার সাথে তাদের আনুগত্য করেছেন তা থেকে জানা যাবে।

এটা জানার একমাত্র উপায় ইসলামের প্রসিদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার কিতাবসমূহ হতে। যেমন, দু'টি সহীহ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম। সুনান গ্রন্থাবলী, যথা- সুনান আবু দাউদ, নাসাঈ, জামিউত তিরমিযী, মুয়াত্তা মালিক; বিখ্যাত মুসনাদ গ্রন্থাবলী যথা, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি। আরো রয়েছে, তাফসীরের কিতাবসমূহে, মাগাযীবিষয়ক কিতাবসমূহে ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাবলী যে গুলোতে ইসলামের বিভিন্ন দিকগুলো উম্মতের জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর আসার (তথা পূর্ববর্তীদের বাণী ও কর্ম) সম্বলিত সংক্ষেপে রচিত ও সংক্ষিপ্ত হাদীসের গ্রন্থাবলী যা এক অংশ অপর অংশকে সু-প্রমাণিত করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। তারা এ মর্মে যথোচিত শ্রম প্রদান করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দীনকে তার অনুসারীদের জন্যে তাদের দ্বারা সুরক্ষিত করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার বিষয়ে অসংখ্য আলিমগণ হাদীস ও 'আসার'সমূহ সংকলন করেছেন। যথা- হাম্মাদ ইবন সালামাহ, আব্দুর

রহমান ইবন মাহদী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান দারেমী, উসমান ইবন সা'ঈদ দারেমীসহ তাদের স্তর বিশিষ্ট অনেকে। তাদের মতোই ইমাম বুখারী এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ প্রমুখ স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অধ্যায় অধ্যায় করে সুবিন্যস্ত করেছেন।

আবু বকর ইবন আছরাম, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, আবু বকর, খাল্লাল, আবুল কাশিম ত্বব্রানী, আবু শাইখ আছবাহানী, আবু বকর আজুররী, আবুল হাছান দারাকুতনী, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ, আবুল কাসিম লালকাঈ, আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ, আবু উমার ত্বলমানকী, আবু নঈম আছবাহানী, আবু যর হারওয়ী, আবু বকর বায়হাকীসহ অনেকের স্বতন্ত্র রচিত গ্রন্থাবলী। যদিও এসব অনেক গ্রন্থাবলীতে কোনো কোনো স্থানে দ'ঈফ হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে যা বিজ্ঞ আলিমগণ সনাক্ত করতে সক্ষম।

আবার দেখা যায় কোনো কোনো মনীষী আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীসহ আক্বীদাগত বিভিন্ন বিষয় ও দীনের অনেক বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচার এবং তা জাল। আর এ ধরনের জাল ও বানোয়াট হাদীস সাধারণত দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার হলো, এমন ভিত্তিহীন বাতিল কথা যা উচ্চারণ করাই অবৈধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করাতো দূরের কথা।

দ্বিতীয়ত প্রকার হলো, এমন কথা যা কোনো পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা আলেম অথবা কোনো সাধারণ লোক বলেছেন। আর তা কখনও সঠিকও হতে পারে বা ইজতেহাদী ফাতওয়া; যার মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করা যেতে পারে অথবা কোনো প্রবক্তার মাযহাবী দর্শনও হতে পারে। পরবর্তীতে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যারা হাদীস জানে না তাদের কাছে অনেক। এ ধরনের কতক মাসআলা

যেগুলো আবিষ্কার করেছেন শাইখ আবুল ফরজ আব্দুল ওয়াহেদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-আনসারী। তিনি তার কিতাবটিকে সুন্নী ও বেদয়ীর মধ্যে পার্থক্যকারী আখ্যায়িত করেন। এগুলো বেশ কিছু প্রসিদ্ধ বিষয়। এ কাজ কতক মিথ্যুক করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ রচনা করে এ গুলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানও থাকে সে জানে যে, এটি মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ ধরনের মাসায়েল যদিও এর অধিকাংশ সুন্নাতের মূলনীতিসমূহের অনুসারণে হয়, তারপরও যদি কেউ এর বিরোধিতা করে তাকে এ কথা বলা যাবে না লোকটি বিদ‘আতী। যেমন, ‘সর্বপ্রথম নি‘আমত যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তার কোনো বান্দাকে অনুগ্রহ করেন’ এ মাসয়ালাটি বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে মত পার্থক্যটি তাদের মধ্যে শাব্দিক। কারণ, এর ভিত্তি হলো, যে মজার পর কষ্ট আসে তাকে নি‘আমত বলা হবে কি না? এখানেও কিছু গুরুত্বহীন কথা-বার্তা বিদ্যমান।

সুতরাং কর্তব্য হলো সহীহ ও জাল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করা। কারণ, সুন্নাহ হলো শাশ্বত সত্য, মিথ্যা ও বাতিল হক হতে পারে না। আর তা হলো সহীহ হাদীসসমূহ; জাল হাদীস নয়। সাধারণভাবে এটাই মুসলিমের জন্য এবং বিশেষ করে যারা নির্ভেজালভাবে সুন্নতের অনুসরণের দাবীদার তাদের জন্যে যা একটি বড় মূলনীতি।

পরিচ্ছেদ

ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার দীন তথা জীবন ব্যবস্থা হলো বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে মধ্যপন্থা। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে শয়তান দু'টি জিনিষ তুলে ধরেছে যে কোনো একটি দ্বারা সফল হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এক- সীমালঙ্ঘন, দুই- শিথিলতা। এ দু'টি কোনটি দিয়ে সফলতা আসল তা তার দেখার বিষয় নয়।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শাশ্বত দীন তথা জীবন ব্যবস্থা। এ দীন ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কারও নিকট থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। অথচ ইসলামে দীক্ষিত অনেককেই শয়তান গ্রাস করেছে। এমনকি বহু লোককে ইসলামের অনেক বিধান থেকে শয়তান বিচ্যুত করেছে। বরং উম্মতের শীর্ষস্থানীয় বহু আবেদ ও তাকওয়া দীপ্ত গোষ্ঠীকে পদস্খলিত করেছে। তারা ইসলাম থেকে পরিষ্কার বের হয়ে গেছে; যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।

ক- অধিক ইবাদাত করার পরও দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া:

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী প্রশাসনকে দীন থেকে বের হওয়া এসব ব্যক্তিদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে আমীরুল মুমিনীন আলী, আবু সা'ঈদ খুদরী, সাহল ইবন হানীফ, আবু যর গিফারী, সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবন উমার, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ প্রমুখ কর্তৃক বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্বক তাদের বিবরণীতে বলেছেন-

«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»

"তাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত (সালাত) তোমাদের কাছেই তুচ্ছ বলে মনে হবে। তাদের সাওমের (রোযা) পাশে তোমাদের সাওম তোমাদের কাছেই তুচ্ছ বলে মনে হবে। তাদের কুরআন পাঠের পাশে তোমাদের কুরআন পাঠ তোমাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে। তারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন ধনুক থেকে (দ্রুত) বেরিয়ে যায় তেমনি তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা কর অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কার থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে 'আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।[31]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

«شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه»

"আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত হলো এরাই। পক্ষান্তরে এদের হাতে যারা শহীদ হবে তারা হবে সর্বোত্তম নিহত"।[32]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

---

[31] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৬

[32] সহীহ বুখারী

«لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ»

“খারেজীদের যারা হত্যা করে তারা যদি রাসূলের ভাষায় তাদের জন্য যা ফায়সালা করা হয়েছে তা জানত, তা হলে তারা আমল করা থেকে বিরত থাকত”।[33]

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফত আমলে যখন ঐসব খারিজীদের আবির্ভাব ঘটে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক ও তাদেরকে হত্যার প্রতি উৎসাহ দানের ভিত্তিমূলক হাদীসের আলোকে সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতৈক্য অনুযায়ী আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাদেরকে হত্যা করেন। তাদের হত্যার ব্যাপারে ইসলামের সব নেতৃবৃন্দ একমত হন।

এমনভাবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে হত্যা করা হয় মুসলিমদের দল পরিত্যাগকারীদেরকে। আরো হত্যা করা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও শরী‘আতের বিরোধিতাকারী ও ভ্রান্ত প্রবৃত্তির পূজারী এবং বিদ‘আতের অনুসারীদেরকে।

খ- এমন বাড়াবাড়ি যা কুফুরির দিকে নিয়ে যায়:

এরই ভিত্তিতে মুসলিমগণ রাফেদ্বী সম্প্রদায়কেও হত্যা করে। কারণ, তারা ওই (খারেজী) ভ্রান্ত দলের চেয়েও নিকৃষ্ট। এরা তিন খলীফাসহ অন্যান্য শাসক ও শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। তারা দাবী করে পৃথিবীতে কেবল তারাই ঈমানদার বাকী সবাই কাফির। তারা আরও কাফির বলে থাকে সেসব মুমিন লোকদেরকে, যারা আল্লাহ তা‘আলাকে আখিরাতে

[33] সহীহ বুখারী: ৩৮৩/৬, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৬৮

দেখতে পাবে বলে বিশ্বাস করে, অথবা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তাঁর জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ইচ্ছা শক্তির গুণ সাব্যস্ত করে। তারা যে বিদআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে তারা কাফির আখ্যায়িত করে।

তারা মোজা ছাড়াই দু পা মাসাহ করে। তারা তারকা উদয় হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাত ও ইফতার বিলম্ব করে। বিনা কারণে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রিত করে পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সর্বদা কুনুতে নাযিলাহ বা বদ-দো'আ পাঠ করে। মাশরুম জাতীয় খাবারকে হারাম মনে করে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা যবাইকৃত পশু ও তাদের ভিন্নমত পোষণকারী মুসলিমদের দ্বারা জবাই করা পশুর গোস্ত হারাম ভাবে। কারণ তাদের নিকট এরা সবাই কাফির। তারা সাহাবীগণের বিষয়ে মারাত্মক কথা বলে- যা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এরূপ বিবিধ কারণে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের আলোকে মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

বাতিল ও ভ্রষ্টতার মূলনীতি

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণ যুগে মুসলিমগণের সাথে সম্পৃক্তকারী কেউ কেউ বিশাল ইবাদাত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে প্রমাণিত হলো আধুনিক কালেও ইসলাম ও সুন্নতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কোনো লোক ইসলাম ও সুন্নাহ হতে বেরিয়ে যাবে। এমনকি অনেকেই সুন্নতের অনুসারী দাবী করবে কিন্তু তারা সুন্নতের অনুসারী নয়; বরং তারা ইসলাম ও সুন্নাহ হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেছে। আর এর পশ্চাতে রয়েছে বহু কারণ:

সুন্নাহ থেকে বের হওয়ার কারণ:

[১] বাড়াবাড়ি: এ বাড়াবাড়ি হলো সেই অপরাধ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যার নিন্দা করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ١٧١﴾ [النساء: ١٧١]

“হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলও না, নিশ্চয় ঈসা মাসীহ তো আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও তার বাণী যা তিনি মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, আর তার পক্ষ হতে নির্দেশ। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর বলও না তিনজন (ইলাহ আছে), (তোমাদের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে) নিবৃত্ত হও, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, নিশ্চয় এক আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত ইলাহ, তিনি কোনো সন্তান

হওয়া হতে পূত পবিত্র। আসমানসমূহে আর জমিনে যা আছে সবকিছু তারই, আর আল্লাহ তা'আলাই কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧﴾ [المائدة: ٧٧]

"বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের দীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুত: তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إياكم والغو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»

"দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার কর। কারণ, তোমাদের ইতিঃপূর্বের লোকেরা দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে"। হাদীসটি সহীহ।[34]

[২] দলাদলি ও মতভেদ যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা মহা-গ্রন্থ আল কুরআনের বহুবার করেছেন।[35]

---

[34] মুসনাদে আহমদ: ২১৫/১, নাসায়ী: ২৬৮/৫

[35] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥﴾ [ال عمران: ١٠٥] আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫]

[৩] জাল হাদীসের ওপর আমল করা:

এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত এমন হাদীস যা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতৈক্য অনুসারে তাঁর ওপর অর্পিত মিথ্যাচার। মূর্খগণ ঐগুলো হাদীস বলে শ্রবণ করে। আর ধারণা প্রসূতভাবে কু-প্রবৃত্তির চরিতার্থে তা সত্য বলে গ্রহণও করে।

[৪] পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে: প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ধারণার অনুগামী হওয়া, যেমন- আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও ধারনার অনুসারী যাদের নিন্দা করেছেন তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ ٢٣﴾ [النجم : ٢٣]

"তারা তো শুধু ধারণা আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের 'রব' এর পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে"। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ ٢ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم : ١، ٤]

"শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়"। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১-৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ﴾ [الانعام: ١٥٩] "নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৯]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি, যে দু'টি অজ্ঞতা ও যুলুম, সে দু'টি খারাপ গুণ থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পথভ্রষ্ট হলো সেই ব্যক্তি যে হক জানে না। আর বিভ্রান্ত হলো সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বিবৃতি প্রদান করছেন এ মর্মে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রবৃত্তি হতে কোনও কথা বলেন নি। বরং তা ছিল ওহী যা আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এখন আমি কিছু বাতিল পন্থীদের কতক মূলনীতি আলোচনা করব, যারা নিজেদের সুন্নতের অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ তারা সুন্নাত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং বড় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিথ্যা বানোয়াট হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বিষয়ে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে যা ইসলামের স্বর্ণ যুগে সংকলিত হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না সে সব হাদীস সম্পর্কে আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি ও জানি যে, তা মিথ্যা ও অপবাদ। এমন কি এটি নিকৃষ্টতম কুফরি কর্ম। আবার তারা কুফরির অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু কথাও বলে যার ওপর কোনো হাদীসও পাওয়া যায় না। যেমন তাদের বর্ণিত একটি হাদীস:

«أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরাফার দিনের সন্ধ্যা বেলা মাঠে উটের উপর সাওয়ারী হয়ে আরাফায় অবতরণ করেন। আরোহণকারীদের সঙ্গে মুসাফা ও

পদ ব্রজে চলমান ব্যক্তিদের সাথে কোলাকুলি করেন।” এটি আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বড় ধরনের মিথ্যাচার ও অপবাদ। এ কথা যিনি বলেছেন, তিনি আল্লাহ তা‘আলার ওপর না হক অপবাদকারীদের মধ্যে বড় অপবাদদাতা। মুসলিমদের কেউ এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন নি; বরং মুসলিম হাদীস বিজ্ঞানী ও সর্ব শ্রেণীর আলেমদের মতৈক্য অনুযায়ী এটি রাসূলের ওপর একটি মিথ্যাচার। জ্ঞানীরা যেমন, ইবন কুতাইবাহ ও অন্যান্যরা বলেন, এ হাদীস বা এ ধরনের আরো যে সব জাল হাদীস রয়েছে, সেগুলো আবিষ্কার করেছে যিনদীক তথা গোপন কাফির সম্প্রদায়; যাতে তারা হাদীস বিজ্ঞানীদের কলংকিত করতে সক্ষম হয় এবং তারা বলতে পারে যে, তারাও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন।

এরূপ আরেকটি হাদীস হলো:

«أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف»

“মুযদালিফা থেকে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তিনি আল্লাহ তা‘আলাকে স্বচক্ষে দেখেছেন যে, তিনি হজব্রতকারীদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তার গায়ে ছিল পশমি জুব্বা”।

এরূপ বহু অপবাদ ও মিথ্যাচার তারা আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলের ওপর আরোপ করেছে, যা আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল সম্পর্কে জানে এমন কোনো ব্যক্তি উচ্চারণও করতে পারে না।

অনুরূপ আরেকটি হাদীস হল:

«أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে চলাচল করেন। যখন সবুজ স্থানে যান তখন তারা বলেন এটা আল্লাহ তা‘আলার দু’পা রাখার স্থান”। এ মর্মে নিম্ন আয়াতটি তারা দলীল বলে পেশ করে থাকেন। আয়াতটি হলো-

﴿فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ ٥٠﴾ [الروم: ٥٠]

“আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা কর, কীভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন” [সূরা রূম, আয়াত: ৫০]

আলেম সমাজের ঐকমত্য অনুযায়ী এটিও মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা এ কথা বলেন নি যে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার পদক্ষেপের ফলসমূহের প্রতি চিন্তা-ভাবনা কর বরং তিনি বলেছেন,

«آثار رحمت الله»

“আল্লাহ তা‘আলার রহমতের ফল সম্পর্কে”। এখানে রহমত অর্থ হলো উৎপন্ন বস্তুসমূহ; শস্য ও সবুজ তৃণলতা।

অনুরূপভাবে তাদের বানানো হাদীসের আরো অংশ হলো:

«أن محمدا رأي ربه في الطواف»

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ‘রব’-কে তাওয়াফে দেখেছেন”। তাদের বানোয়াট হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

«أنه رآه خارج من مكة»

“তিনি মক্কার বাহিরে আল্লাহকে দেখেছেন”।

তাদের বানোয়াট হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

«أنه رآه في بعض سكك المدينة»

“মদিনার কোনো কোনো গলিতে তিনি তাকে দেখেছেন”। এরূপ বহু বানোয়াট হাদীস, যা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ছেড়ে দিলাম।

বস্তুত যত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহ তা‘আলাকে দুনিয়াতে দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিম জাতির ঐকমত্যে ও আলেম সমাজের মতৈক্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ মর্মে কোনো হাদীস মুসলিম মনীষীদের কেউই বর্ণনা করেন নি।

তবে মি‘রাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছেন কি না এ মর্মে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। ইবন আব্বাসসহ আহলে সুন্নতের বহু আলেম বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি‘রাজে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছেন। পক্ষান্তরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ একটি দল পূর্বোক্ত অভিমত অস্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন নি এবং এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসাও কেউ করেন নি। এ বিষয়ে কতিপয় মূর্খরা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক যে হাদীসটি বর্ণনা করে যে, তিনি আল্লাহ তা‘আলার রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মি‘রাজে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছেন, তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি। অপরদিকে ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বলেছেন, আমি দেখি নি”। আলেম সমাজের ঐকমতে এই হাদীসও মিথ্যা। এ ধরনের কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি।

এ জন্যে ইমাম কাজী আবু ইয়া‘লাসহ অনেক ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদ কর্তৃক এ বিষয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

[ক] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার মধ্যে স্থাপিত দুই চোখে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছেন এ কথা বলা যাবে কিনা?

[খ] নাকি বলা যাবে যে, তিনি অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন?

[গ] অথবা তিনি দেখেছেন তবে এ কথা বলা যাবে না যে মাথায় স্থাপিত দুই চোখ দ্বারা দেখেছেন বা অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন?

অনুরূপভাবে ঐ হাদীস পণ্ডিতগণ ইবন আব্বাস ও উম্মে তুফাইলসহ অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

«رأيت ربي في صورة كذا وكذا»

“আমি আমার রবকে এই রূপ এই রূপ আকৃতিতে দেখছি” সে হাদীসে রয়েছে-

«أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري»

“তিনি আমার দুই কাঁধের উপর তার হাত রাখলেন এমন কি তার আঙ্গুলসমূহের শীতলতা আমার বক্ষদেশে অনুভব করলাম”। এ হাদীস মি‘রাজের রজনীর হাদীস নয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মদীনায়। কারণ, হাদীসে এ পরিভাষা রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের সালাতে বাধাগ্রস্ত হলেন। তারপর সাহাবীগণের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি এ রূপ এ রূপ দেখলাম। এ বর্ণনা এসেছে এ সব লোকদের থেকে যারা কেবল মদীনায় রাসূলের পিছনে সালাত আদায় করেন। যেমন, উম্মে তুফাইল ও অন্যান্যরা। আর পবিত্র কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীস ও আলেমদের ঐকমত্য অনুসারে মি‘রাজ সংঘটিত হয়েছে মক্কায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ۝١﴾ [الاسراء: ١]

“পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে কোনো এক রজনীতে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১]

দীর্ঘ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীসটিতে যে স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে তা ছিল মদীনার ঘুমের মধ্যে সংঘটিত স্বপ্ন। যেমনটি হাদীসের অসংখ্য সনদে বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়েছে যে, 'তা ছিল ঘুমের স্বপ্ন' অথচ নবীদের স্বপ্নও অহী। অতএব, মি'রাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় কোনো দর্শন ছিল না।

মুসলিমগণ একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন নি। আর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কখনো দুনিয়াতে নেমে আসেন নি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কখনও কোনো হাদীসে এরূপ পরিভাষা আসে নি যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বরং প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে,

«أن الله يدنو عشية عرفة»

"আরাফার দিনে বিকাল বেলায় আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন"।

অপর বর্ণনায়,

«أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»

"রাতের শেষের তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে এসে বলেন, যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিয়ে দিব। আমার নিকট যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব"।[36]

আর সহীহ হাদীসে এসেছে,

«أن الله يدنو عشية عرفة»

"আরাফার দিনে বিকাল বেলায় আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন"।

[36] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৫, তাহাজ্জুদ অধ্যায় ২৯/৩

অপর বর্ণনায় এসেছে,

«إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء»

“পৃথিবীর নিকটতম আসমানে আসেন। তারপর আরাফাবাসীদের বিষয়ে ফিরিশতাদের সঙ্গে গর্ববোধ করেন। তাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দারা এলোমেলো চুল, ধুলায় ধুসরিত অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। তারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে”?

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা শাবান মাসের পনের তারিখে অবতরণ করেন, যদি হাদীসটি সহীহ হয়; কিন্তু হাদীস যাচাই-বাছাইকারী মহা বিজ্ঞানীগণ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

অনুরূপ ভাবে কেউ কেউ বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন একদা আল্লাহ তা‘আলা আসমান যমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে রাসূলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। আহলে ইলমের ঐকমত্য মোতাবেক এ হাদীসটিও সম্পূর্ণ ভুল; বরং সহীহ হাদীসসমূহে এটাই এসেছে যে, সে ফেরেশতা জিবরীলই তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যিনি হেরা গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে তাকে বলেছিলেন,

«اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال»

“তুমি পড়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলছেন, তুমি পড়, আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবারো ধরে নেন এবং চাপ

দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি বল-

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥﴾ [العلق: ١، ٥]

"তুমি পড়! তোমার 'রব' এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে 'আলাক (জমাট রক্ত) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়! তোমার রব সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানত না"। [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১-৫]

এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ প্রথম অহী। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী নাযিল হওয়ার বিরতি সম্পর্কে বলেন,

«فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً فرفعت رأسي فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء أراه جالسا على كرسي بين السماء والأرض»

"আমি হেটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা উত্তোলন করলাম। দেখলাম ঐ জিবরীল ফিরিশতা যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন। তাকে দেখলাম যে, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন"।[37]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে উপবিষ্ট হেরা গুহায় আগত ফিরিশতাই হলেন ইনি। তারপর তাকে দেখে তিনি যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন।

[37] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪

কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় ‘মালাক’ শব্দটি এসেছে, অর্থাৎ ফিরিশতা; কিন্তু পাঠক পড়ছেন মালিক অর্থাৎ আল্লাহ; অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপবিষ্ট ছিলেন ফিরিশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম।[38]

সারকথা হলো, যে সব হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছেন, আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলার পদাঙ্কসমূহ হলো জান্নাতের বাগিচা, আল্লাহ তা‘আলা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর আঙ্গিনায় চলাচল করেছেন, এসব হাদীস হলো আহলে হাদীস তথা হাদীস বিশারদগণসহ সকল মুসলিমের ঐকমত্য অনুযায়ী মিথ্যা ও বাতিল।

অনুরূপভাবে যে দাবী করে, সে আল্লাহ তা‘আলাকে মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ্যে স্বচক্ষে দেখেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইজমা অনুযায়ী তার দাবীও বাতিল। কারণ, সকল মুসলিম এ বিষয়ে একমত যে, মৃত্যুর পূর্বে কোনো মুমিন স্বচক্ষে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পারবে না।

বিষয়টি নাওয়াস ইবন সাম‘আন কর্তৃক সহীহ মুসলিম দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন,

«واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت»

“তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে তার ‘রব’-কে দেখতে পাবে না”।[39]

এ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জাতিকে দাজ্জালের ফিতনা বিষয়ে সর্তক করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করে

---

[38] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান: ৩১৪/৬

[39] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৩১

বলে দিয়েছেন, কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। সুতরাং কেউ যেন দাজ্জালকে দেখে এ ধারণা না করে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলা।

তবে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের বিষয়ে ঈমানদারদের অন্তরে এমন গুণ সন্নিবেশিত হয় যে, তাদের হৃদয়ের গভীর প্রত্যয়, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্যে হৃদয়ের চোখে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ মনে করার বহু স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম স্তর হলো ইহসান।

হাদীসে জিবরীলে ইহসান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

"ইহসান হলো তুমি এমনভাবে ইবাদাত করবে যাতে মনে হয় তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে অবশ্যই মনে করবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন"।

কখনো কখনো সময় মুমিনরা স্বপ্নে তাদের ঈমানের স্তর অনুযায়ী আল্লাহকে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখতে পাবেন। তাদের ঈমান যদি ভালো হয়, তবে ভালো আকৃতিতে তাকে দেখতে পাবে। আর তাদের ঈমান যদি খারাপ হয় তবে খারাপ আকৃতিতে দেখতে পাবেন। স্বপ্নে দেখার বিধান আর বাস্তবে দেখার বিধান এক নয়। কারণ, স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে এবং স্বপ্নে মানুষ বাস্তব বস্তুর বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি দেখতে পায়।

অনেক মানুষ এমন আছে জাগ্রত অবস্থায়ও তার অন্তরে স্বপ্নে দেখার মত বিভিন্ন জিনিস ভেসে উঠতে পারে। তখন সে অন্তর দিয়ে ঘুমন্ত লোকের মত অনেক কিছুই দেখতে পায়। কখনও কখনও তার অন্তর দিয়ে দেখা বিষয় বাস্তব দেখা বলেই মনে হয়, এ গুলো সবই দুনিয়াতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

আবার কখনও কখনও তাদের কেউ কেউ যে সব বস্তু অন্তর দিয়ে দেখছে ও ইন্দ্রিয় দিয়ে একত্রিত করছে তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে সে মনে করে যে সে তো এটা তার দু'চোখ দিয়েই দেখছে। অতঃপর যখন জাগ্রত হয়, তখন বুঝতে পারে যে সে তো স্বপ্নে তা দেখেছে। আবার কখনও কখনও স্বপ্নেও বুঝতে পারে যে আসলে তা স্বপ্ন।

সুতরাং ইবাদতকারী লোকদের কাউকে দেখা যাবে যে, যার এ ধরনের হৃদয়ের দর্শন এমন প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে যে সে সম্পূর্ণরূপে অনুভূতি শুণ্য হয়ে পড়ে। তখন সে মনে করে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অথচ সে ভ্রান্তিতে আছে। পূর্বের বা পরবর্তী যুগের যে সব মনীষীরা আল্লাহকে এ ধরনের স্বচক্ষে দেখার দাবী করে থাকে, উম্মতের জ্ঞানী ও ঈমানদার সবার মতে সে ভ্রান্তিতে নিপতিত।

জান্নাতে মুমিনরা তাদের প্রভুকে দেখবেন:

হ্যাঁ, স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ মুমিনগণের জন্য কেবল জান্নাতেই হবে। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য এটি সংঘটিত হবে কিয়ামতের মহা ময়দানে। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অকাট্য হাদীসসমূহ দ্বারা সু-প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب»

“নিশ্চয় তোমরা অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে দ্বি-প্রহরে সূর্য দেখতে পাও, যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র দেখতে পাও”।[40]

[40] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩/২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«جنان الفردوس اربع: جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ، عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»

"ফিরদাউসের বাগানসমূহ চারটি, দু'টি জান্নাত রূপার, তার পাত্র ও তাতে যা কিছু রয়েছে তাও রূপার। আর দু'টি জান্নাত স্বর্ণের তার পাত্র ও তাতে যা কিছু রয়েছে সবই স্বর্ণের। জান্নাতীদের মাঝে এবং রবকে দেখার মাঝে বাধা জান্নাতে 'আদনে একমাত্র তার চেহারায় বড়ত্বের চাদর"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ نادي منادِ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويُجِرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة»

"যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী বলবেন, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে আপনাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি তা আপনাদেরকে প্রদান করবেন। জান্নাতবাসীগণ বলবেন সেটি আবার কি! আমাদের চেহারা কি উজ্জ্বল হয় নি! আমাদের আমল নামা কি ভারী হয় নি! আমাদেরকে কি জান্নাত দেন নি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি! এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পর্দা উঠে যাবে। তারা তাকে দেখবে। এমনকি তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রিয় হবে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ। আর এটি অতিরিক্ত"।[41]

মু'তাযিলা ও রাফেদ্বীদের অবস্থান:

---

[41] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৭

উপরোক্ত হাদীসসমূহ সহীহ হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী আলেম সমাজ ও ইমামগণ এ হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হাদীসগুলো গ্রহণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। শুধুমাত্র জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলা, রাফেদ্বী ও অনুরূপ আক্বীদাপন্থী দলের লোকেরা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, তারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, দর্শনসহ বিভিন্ন আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করেছে। এরাই হলো নির্গুণবাদী মু'আততিলাহ; সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব।

আল্লাহর দীন ইসলাম মধ্যপন্থী দীন, যাতে কোনো বাড়াবাড়ি নেই এবং হঠকারিতাও নেই। উভয় বাতিল সম্প্রদায় এক- যারা আখিরাতে আল্লাহর দর্শণ লাভ বিষয়ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহকে অস্বীকার করে, দুই- যারা বাড়াবাড়িকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে দুনিয়াতে চোখ দ্বারা দেখা যাবে বলে দাবি করে- এ উভয় দলের মাঝামাঝিতে ইসলামের অবস্থান। বাকী উভয় দলই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারীদের অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকে মিথ্যা মনে করা, চরমপন্থীদের দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাওয়ার দাবীকে সত্য বলে মনে করা, এ দু'টির মাঝামাঝি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার দীন। এ দু'টি আক্বীদাই বাতিল। এসব লোকদের কারো কারো দাবী যে, সে পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছে। এরাও পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় পথভ্রষ্ট। যদি তারা কোনো সত্যপরায়ণ ব্যক্তি অথবা সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র প্রধান কিংবা অন্য কোনো ধরণের মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দাবি করে,

তাহলে তাদের পথভ্রষ্টটা ও কুফুরী আরো মারাত্মক হবে। তখন তারা ঐসব খ্রিস্টানদের থেকেও অধিক পথভ্রষ্ট যারা দাবী করেছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ঈসা ইবন মারইয়ামের আকৃতিতে দেখেছে।

এরা হলো শেষ জামানার দজ্জালের অনুচর পথভ্রষ্ট-কারীর চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধিক গোমরাহ। দাজ্জাল মানুষকে বলবে আমি তোমাদের রব, সে আসমানকে নির্দেশ দিবে, অতঃপর বৃষ্টি প্রবাহিত হবে এবং যমীনকে নির্দেশ দিবে, অতঃপর সুজলা-সুফলা ফসল উৎপাদিত হবে। সে অনাবাদী যমীনকে বলবে তোমার ভিতর প্রোথিত সম্পদ বের করে দাও সঙ্গে সঙ্গে যমীন তা বের করে দিবে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিকে দজ্জাল বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من خلق آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم من الدجال»

“আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সবুজ শস্য শ্যামল পৃথিবীতে যত ফিতনার ঘটনার অবতারণা হবে তার মধ্যে দজ্জালের ঘটনাই হবে সবচেয়ে বড় ফিতনা”।[42]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللَّهُمَّ إني أعوذبك من عذاب جهنم، وأعوذبك من عذاب القبر، وأعوذبك من فتنة المحيا والممات، وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال»

“তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাতের সমাপনী বৈঠকে বসে তখন সে যেন চারটি বিষয় থেকে মুক্তির জন্যে আশ্রয় চেয়ে বলে, হে আল্লাহ তা'আলা! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি, কবরের সাজা

[42] তাবরানী, আওসাতে কবীর, হাদীস নং ৩৩৬

হতে নিষ্কৃতির জন্যে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জীবন ও মরণের পরীক্ষার বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি এবং মাসীহ দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্যে তোমার দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা করছি"।

এ দাজ্জাল রুবুবিয়্যাহ দাবী করবে এবং কিছু সংশয় বিষয় নিয়ে আসবে যদ্বারা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহ তা'আলার দাবীদার দাজ্জালের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور»

"জেনে রাখ! দাজ্জাল হবে কানা, আর তোমাদের রব কানা নন"।[43]

তিনি আরো বলেছেন, তোমরা ভালোভাবে জেনে রেখ! তোমাদের মধ্যে কেউই কখনই মৃত্যুর পূর্বে তার আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না"। উম্মতের জন্যে উপরোক্ত দু'টি প্রকাশ্য আলামত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। মানুষ সে দু'টি চিহ্নের মাধ্যমে মিথ্যা আল্লাহ তা'আলা দাবীদার দাজ্জালকে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, দাজ্জালের পরীক্ষায় কিছু মানুষ পথভ্রষ্ট হবে তারা দুনিয়াতে মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা জায়েয বলবে। যেমন, ঐসব বিভ্রান্তকারী পথভ্রষ্ট যাদের নাম করা হয় সর্বেশ্বর-বাদী ও অদ্বৈতবাদী। (তারা প্রধানত এ দু'টি ভাগে বিভক্ত। এ প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদ মনে করে।[44])

হুলুলের আকীদা পোষণকারী সর্বেশ্বরবাদীদের প্রকার:

তারা দুই প্রকার:

---

[43] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩৭

[44] অনুবাদক

ক- এক সম্প্রদায়ের লোক এমন আছে আল্লাহ তা'আলাকে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদে বিশেষিত করে। যেমন, খ্রিস্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ও চরমপন্থীরা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সমমানের লোকদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। অপর কিছু লোক পীর, মাশাইখদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বলে বিশ্বাস করে। আর কিছু লোক রাজা-বাদশাহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বলে বিশ্বাস করে থাকেন। আর কিছু লোক সুন্দর সুন্দর ছবির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আছে বিশ্বাস করে। ইত্যাদি ভ্রান্ত কথা-বার্তা রয়েছে যেগুলো খৃস্টানদের কথার চেয়েও নিকৃষ্ট।

খ- দ্বিতীয় শ্রেণী: এ শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে সব বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদ বলে। এমনকি তারা সকল অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান বলে মনে করে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে কুকুর, শূকর, অপবিত্র বস্তুসহ অন্যান্য সবকিছুতে আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান। এটি জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের মতাবলম্বী এবং অদ্বৈতবাদী মত। যেমন, ইবন 'আরাবী, ইবন ফারিদ্ব, ইবন সাব'ঈন, তিলমসানীও বালয়ানী প্রমুখের অনুসারীদের বিশ্বাস ।

অথচ সকল রাসূল, তাদের অনুসারী মুমিন ও আহলে কিতাবের মাযহাব হলো, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুর রব, মহান আরশের রব, সকল সৃষ্টি তারই বান্দা। তারা তার প্রতি মুখাপেক্ষী। মহা মহিম পবিত্র আল্লাহ তা'আলা আসমানের আরশের উপর রয়েছেন। সৃষ্ট জীব থেকে তিনি অনেক দূরে। এতদসত্বেও তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤﴾ [الحديد: ٤]

"তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন"। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪]

সীমালঙ্ঘনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের শাস্তি:

ঐসব কাফির পথভ্রষ্টরা, যাদের কোনো একজন দাবী করে যে, সে তার রববে তার দুই চোখে দেখেছে। কখনো কখনো এ দাবী করে যে, সে তার সাথে বসেছে, তার সাথে কথা বলেছে, তার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছে অথবা তিনি সবার সঙ্গে আছেন। আবার কখনো কখনো বলে, মানুষ ছোট বালক বা বড় মানুষ ইত্যাদি ধারণা করে। আবার কখনো সময় এ দাবী করে যে, তিনি তাদের সাথে কথা বলেছেন। এ সব দাবি যারাই করবে তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে, ভালো না হয় তাদের হত্যা করা হবে। এ ধরনের লোকেরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের চেয়েও বড় কাফির। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ কাফির এ জন্যে যে, তারা বলে মাসীহ ইবন মরইয়াম-ই আল্লাহ তা'আলা। প্রকৃতপক্ষে মাসীহ হলেন সম্মানিত রাসূল। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদাবান এবং আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ঠদেরও অন্যতম। সুতরাং তারা যখন এ আক্বীদা পোষণ করে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-ই আল্লাহ এবং আল্লাহ ও ঈসা আলাইহিস সালাম একাকার হয়েছেন অথবা আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন', তখন তাদের

কুফুরী নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের কাফির হওয়া আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। যখন তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে যারা বলেছে আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন,

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ٨٨ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا ٨٩ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ٩١ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣﴾ [مريم: ٨٨، ٩٣]

"তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছে।' তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ ফেটে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখন্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। কারণ, তারা রহমানের ওপর সন্তান আরোপ করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার জন্যে শোভা পায় না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে বান্দা রূপে আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হবে না"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৮-৯৩]

অতএব, সে লোকের কী হবে, যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তা'আলা বলে দাবী করে? বরং সে তো চরমপন্থী মতবাদের লোকদের চেয়ে বড় কুফুরী করেছে; যারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অথবা বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্ত কাউকে আল্লাহ বলে দাবী করত।

বস্তুত এরাই সেসব যিন্দিক বা প্রচ্ছন্ন কাফের-মুনাফিক, যাদেরকে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তিনি গর্ত করার নির্দেশ দিলেন, কিন্দা দরজার কাছে তা খনন করা হলো। তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে সময় দিয়েছে তওবা করার জন্যে। যারা তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। যারা তওবা না করে স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের

ওপর অটল ছিল তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদের হত্যার বিষয়ে সকল সাহাবী একমত ছিলেন। কিন্তু হত্যার ধরণ নিয়ে পরস্পর দ্বিমত ছিল। বিশিষ্ট সাহাবী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর অভিমত ছিল আগুনে না পুড়িয়ে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হোক। আর এটাই সকল আলিমের অভিমত। আর এটি আলিমদের নিকট একটি পরিচিত ঘটনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেককার লোকদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি

বাড়াবাড়ি ধ্বংসের মূল:

অনুরূপভাবে ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, কতিপয় শাইখের বিষয়ে অতিভক্তি, সীমালঙ্ঘন ও অতি বাড়াবাড়ি করা, চাই তা শাইখ ‘আদী অথবা ইউনুস কানবি, মানছুর হাল্লাজ অথবা অনুরূপ যে কোনো ব্যক্তির বিষয়ে হোক। এমনকি মহান খলিফা ও বিশিষ্ট সাহাবী আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-র বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও শীর্ষস্থানীয় নবী ঈসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে বাড়াবাড়িও একই পর্যায়ভুক্ত।

যে ব্যক্তি কোনো বিশিষ্ট নবী অথবা পুণ্যবান ব্যক্তির ব্যাপারে যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অথবা ‘আদী অথবা অন্য কেউ, অথবা অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যার যাকে নেককার লোক মনে করা হয়, যেমন, হাল্লাজ, মিসরের শাসক হাকিম লি আমরিল্লাহ (তথাকথিত ফাতেমী শাসক), ইউনুস কানাবি অথবা এ ধরনের অন্য যে কোনো মানুষের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করল এবং তার মধ্যে ইলাহ-এর কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে করল। যথাঃ এ কথা বলল যে, উমুক পীর বা শাইখের ইচ্ছা মোতাবেক প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য দেওয়া হয় অথবা বকরী জবাইয়ের সময় বলে আমার নেতার নামে, আমার বাবা ও পীরের নামে জবাই দিলাম অথবা সাজদাহর মাধ্যমে তার বা তার মতো কোনো মাখলুকের ইবাদাত করল অথবা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যকে ডাকল, যেমন এভাবে বলা- হে আমার উমুক অভিভাবক আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে রিযিক দাও, আমাকে পরিত্রাণ দাও, আমাকে মুক্তি দাও অথবা একথা বলা যে, তোমার ওপরই আমি তাওয়াক্কুল করলাম, তুমিই আমার জন্যে যথেষ্ট অথবা আমি তোমার যথেষ্টতায় অথবা এ

ধরনের সব কথা ও কর্ম যেগুলো রবের বৈশিষ্ট্য; আর যেসব কথা ও কর্ম কেবল আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য প্রযোজ্য নয়, এমন কিছু করল তখন তা সবই শির্ক ও ভ্রষ্টতা বলে গণ্য হবে। এর জন্যে ঐ ব্যক্তির ওপর তওবা জারী করতে হবে। যদি তওবার নির্দেশ পাওয়ার পরও তওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তাহলে ইসলামী প্রশাসনের রায় অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা হয়, তার সঙ্গে যেন শরীক করা না হয়, যেন তার সঙ্গে অন্য কিছুকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করা হয়।[45]

---

[45] এগুলো সবই ইবাদত যা কেবল এক আল্লাহর জন্য নিবেদন করা হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এবং তার নবী বর্ণনা করেছেন। জবেহ করা ইবাদত হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣] বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। 'তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]
অনুরূপভাবে দো'আও ইবাদাত। যে সব বিষয়ের সমাধান করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রাখে না তা কোন মাখলুকের কাছে চাওয়া, চাই তা সুপারিশকারী হিসেবে চাওয়া হোক বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই চাওয়া হোক তা অবশ্যই শির্ক। সুতরাং দো'আ যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس : ١٠٦].'আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব, তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

আর যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্যান্য ইলাহগুলো ডাকে যেমন— সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উযাইর, ঈসা, ফিরিশতামণ্ডলী, লাত, উয্যা, মানাত, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাছর (প্রভৃতিকে ইলাহ হিসাবে ডাকে) তারা ঐ গুলোকে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকারী, বৃষ্টি বর্ষণ কারী অথবা উদ্ভিদ ও শস্য উৎপাদনকারী স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে না (তবুও তারা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য।)

বস্তুতঃ তারা ফিরিশতামণ্ডলী, নবীগণ, জিন্ন, নক্ষত্ররাজি, নির্মিত মূর্তিসমূহ এবং কবরবাসীর ইবাদাত এ জন্য করে যে, তারা ওদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তারা বলে, তারা আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হবে।

নবী ও রাসূলদের তাওহীদ:

আল্লাহ তা'আলা তার নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন, ইবাদতের ডাকও নয় এবং সাহায্যেরও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ۝٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ۝٥٧﴾ [الاسراء: ٥٦، ٥٧]

"বল, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, (তাদেরকে আহ্বান করলেও দেখবে) তারা তোমাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে বা পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। তারা যাদেরকে আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের 'রব'-এর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তার দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭]

পূর্বসূরি এক দল জ্ঞানী বলেন, প্রাচীনকালে কিছু লোক ছিল যারা মাসীহ, উযাইর ও ফিরিশতামণ্ডলীকে ডাকত, আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন, তোমরা যেমন আমার নিকট নৈকট্য চাও, তোমরা যাদেরকে ডাকছ তারাও তেমনি আমার নৈকট্য চাইত, তোমরা যেমন আমার রহমত চাও তারাও আমার নিকট রহমত চাইত। তোমরা যেমন আমার আযাবকে ভয় কর তারাও আমার আযাবকে ভয় করত। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ۝٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ ۝٢٣﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]

"বল, তোমরা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণও কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'য়ে তাদের কোনোও অংশ নেই, আর তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না"। [সূরা সাবা, আয়াত: ২২-২৩]

মহান পবিত্র আল্লাহ অবহিত করছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন শক্তিকে ডাকা হচ্ছে যাদের আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে অনুপরিমাণ ক্ষমতা ও অংশীদারীত্ব নেই, সৃষ্টি বিষয়ে তাদের কোনো ক্ষমতাও নেই যার দ্বারা সাহায্য করবে। আর আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তারা নিকট কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ۝٢٦﴾ [النجم : ٢٦]

“আকাশসমূহে কত ফিরিশতা রয়েছে। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেবেন”। [সুরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ قُلۡ أَوَلَوۡ كَانُواْ لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَعۡقِلُونَ ٤٣ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٤٤﴾ [الزمر: ٤٢، ٤٣]

“তারা কি আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে (অন্যদেরকে নিজেদের মুক্তির জন্য) সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল, তারা কোনো কিছুর মালিক না হওয়া সত্ত্বেও এবং তারা না বুঝলেও? বল, যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাধীন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা‘আলারই। অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৩-৪৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٨﴾ [يونس : ١٨]

“আর তারা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ তা‘আলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশ সমূহে, আর না জমিনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে অনেক ঊর্ধ্বে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

তাওহীদই হলো নবী রাসূলদের দাওয়াতের চাবি:

দীনের মূল বিষয় হলো এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। আর ঐটাই হলো তাওহীদ যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ٤٥﴾ [الزخرف: ٤٥]

"তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি (আল্লাহ তা'আলা) কি দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মা'বুদ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদাত করা যায়"? [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

"আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও তাগুতকে (সীমা লঙ্ঘনকারী) বর্জনের দাওয়াত দিবে"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

"আপনার পূর্বে আমি কোনো রাসূলকে এ ওহী ব্যতীত প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

তাওহীদের বাস্তবায়ন ও সব ধরনের শির্কের অণু-কণা থেকে সতর্ক করণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেন এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেন। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন তার সামনে বলেছিল আল্লাহ তা'আলা যা চান ও আপনি যা চান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বলেছিলেন,

«أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده»

"তুমি কি আমাকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করছ; বরং আল্লাহ তা'আলা এককভাবে যা চান তাই হয়"।

তারপর বললেন,

«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»

"তুমি এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান; বরং বলবে, আল্লাহ তা'আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চায়"।[46]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন -

«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»

"যে শপথ করতে চায় সে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করবে অথবা নীরব থাকবে"।[47]

তিনি আরো বলেন,

«من حلف بغير الله فقد أشرك»

---

[46] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১১৭

[47] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬৮৫

“যে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শির্ক করল”।[48]

তিনি আরো বলেন,

«لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»

“তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন করে খ্রিস্টানগণ ইবন মারইয়ামের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিশ্চয় আমি একজন বান্দা। অতএব, তোমরা বল, আপনি আল্লাহ তা‘আলার বান্দা ও তার রাসূল”।[49]

এ কারণে আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি কোনো সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করতে পারবে না। যথা- কা‘বা ও অন্যান্য বস্তুর নামে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাজদাহ করতেও নিষেধ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী তাকে সাজদাহ করতে চাইলে তিনি তাদের নিষেধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يصلح السجود إلا الله»

“আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সাজদাহ পাওয়ার উপযোগী কেউই নেই”।[50]

তিনি আরো বলেন,

«لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»

“আমি যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাজদাহ দেওয়ার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে”।[51]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন,

---

48 সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৫

49 সহীহ বুখারী ৪৭৮/৬

50 সুনান তিরমিযী ৩২৪/৪

51 সুনান আবু দাউদ ৬৭/৩

«أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟»

“তুমি যদি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম কর তাহলে কি কবরকে সাজদাহ দিবে? তিনি বললেন, না”।[52]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فلا تسجد لی “আমাকে সাজদাহ করবে না”।

এজন্য কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় বলেন,

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

“আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি লা‘নত বর্ষণ করুন। কারণ, তারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।”

তারা যে কাজ করছে তা থেকে তিনি উম্মতকে সর্তক করে দিয়েছেন। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘যদি আশঙ্কা না হতো তাহলে ঘরের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে তার কবর দেওয়া হত কিন্তু মানুষ মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এ সম্ভাবনায় তিনি তা অপছন্দ করেছেন’।[53]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেন:

«إن من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»

---

[52] সুনান আবু দাউদ ৬৭/৩

[53] সহীহ বুখারী, সালাত অধ্যায়: ৫৩২/১

“তোমাদের পূর্বের লোকেরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদের এ বিষয়ে নিষেধ করলাম”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«اللّٰهُمَّ لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

“হে আল্লাহ তা‘আলা! তুমি আমার কবরকে উপাসনার মূর্তি বানিয়ে দিও না। আল্লাহ তা‘আলার গযব ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকট হয়, যারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদরূপে (ইবাদতের স্থান) গ্রহণ করেছে”।

তিনি আরো বলেন,

«لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليّ حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغن»

“তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার ওপর দরুদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছবে”।[54]

এ কারণে পৃথিবীর সকল আলেম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ শরী‘আতসম্মত নয় এবং এর নিকট সালাত পড়াও ইসলামী বিধি সম্মত নয়; বরং ইসলামের শীর্ষ স্থানীয় আলেম ও নেতৃবর্গের অভিন্ন সিদ্ধান্ত যে, কবরের পার্শ্বের সালাত ইবাদাত হিসেবে গৃহীত হবে না, বরং তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে।

মুসলিমদের কবর যিয়ারত করা, দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সমমর্যাদা সম্পন্ন লোকের নেতৃত্বে তাদের জানাযার সালাত সম্পাদন করা সুন্নত। আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলেন,

---

[54] সুনান আবু দাউদ: ৪৪৭/২

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ﴾ [التوبة: ٨٤]

“তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনই তুমি তার জানাযার সালাতে দাঁড়াবে না ও তার কবরের কাছে দাঁড়াবে না”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮৪]

এ আয়াতের ‘দলীলুল খিতাব’ বা ভাষ্যের দাবী থেকে প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ মুমিনগণের কবরের উপরে তাদের জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করা যাবে এবং তাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়ানা যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণেরকে কবর যিয়ারত-কালীন নিম্নোক্ত দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন-

«السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»

“হে মুমিন সম্প্রদায়ের গৃহকর্মী আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমরা ও ইনশা-আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের ও আপনাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুক। আমাদের ও আপনাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না, তাদের পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিও না। আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও”।[55]

আর এটা এজন্যই যে, মূর্তিপূজার কারণসমূহের অন্যতম কারণ হলো, কবরকে সম্মান প্রদর্শন করা, সেখানে ইবাদাত ও অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[55] মুসনাদ, হাদীস নং ২৪৮০১

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [نوح: ٢٣]

“তারা বলল, তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দিও না। ছেড়ে দিও না ওদ্দা, সুয়া‘আ, ইয়াগুসা, ইয়া‘উকা ও নাছরা (নামক মূর্তিদেরকে)”। [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩]

সালাফদের একটি দল বলেন, এসব নামে বর্ণিত লোকেরা সমকালীন জাতির ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা মারা গেলেন তখন তারা তাদের কবরের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ল। তারপর তাদের ভাস্কর্য, প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে তাদের ‘ইবাদত করা শুরু করল।

তাই আলেমদের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে, যে লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম করতে চায় সে তার কবরের পাথর স্পর্শ ও চুমু দিতে পারবে না। কারণ চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহ তা‘আলার ঘর কা‘বার রুকন বা কোণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার ঘরকে মানুষের ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য করা যাবে না।

অনুরূপভাবে কবরে তওয়াফ, সালাত ও ইবাদতের জন্য সমবেতও হওয়া যাবে না। বস্তুত তওয়াফ, সালাত ও ইবাদাত করা আল্লাহ তা‘আলার ঘরসমূহের অধিকার। আর সেগুলো ঐ মসজিদসমূহ; যাতে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নাম প্রচারের জন্যে, আল্লাহর যিকিরের জন্য আল্লাহ তা‘আলা অনুমতি দিয়েছেন। মানুষের ঘর (কবর)সমূহে উপরোক্ত ইবাদাত বৈধ হবে না। কারণ তা করলে ঈদ হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,لا تتخذوا بيتي عيدا "তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না"।[56]

তাওহীদের গুরুত্ব:

এগুলো হলো তাওহীদকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যা দীনের মৌলিকত্ব ও দীনের মূল। এগুলো ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কারো আমল কবুল করেন না। তাওহীদের বাস্তবায়নকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন; কিন্তু তাওহীদ বর্জনকারীকে ক্ষমা করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾ [النساء : ٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] এ কারণে তাওহীদের কালেমা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট বাক্য। এর মহা নিদর্শন আল কুরআনের আয়াতুল কুরসি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"আল্লাহ তা'আলা, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা (ঘুম) স্পর্শ করে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»

---

[56] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৪২

"যার শেষ কালেমা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[57] ইলাহ হলো ঐ মহান সত্তা যার দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, তাঁর ইবাদতের জন্য, তার সাহায্য কামনায়, তার আশায়, তার ভয়ে, তার সম্মানে ও ইজ্জতে।

[57] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১৬

পরিচ্ছেদ

সুন্নত (আকীদা) তথা আদর্শ অনুসরণে মধ্যপন্থা অনুসরণ করা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সুন্নাহ (আদর্শ) অনুসরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, কোনো প্রকার কম-বেশ করা ছাড়া যেভাবে সুন্নাহ বর্ণিত হয়েছে সেভাবে তার অনুসরণ করা। যেমন, কুরআনে কারীম ও আল্লাহর গুণাবলীসমূহের ব্যাপারে তাদের কথা বা মত।

কুরআন কারীম বিষয়ে পূর্বসূরীদের মাযহাব:

কারণ, এ উম্মতের সঠিক পূর্বসূরী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হলো, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম; অবতীর্ণ বাণী সৃষ্ট বা মাখলুক নয়, এটি আল্লাহ তা'আলার থেকে শুরু হয়েছে এবং তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। এ কথাই পূর্বসূরি একাধিক আলেম বলেছেন। সুফীয়ান ইবন 'উয়াইনা 'আমর ইবন দীনার –যিনি বিশিষ্ট তাবে'ঈনদের একজন ছিলেন - তিনি বলেন, আমি মানুষের মুখে সব সময় শুনে আসছি তারা এ কথাই বলেন। যে কুরআন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন তাই হলো এ কুরআন যেটিকে মুসলিমগণ তিলাওয়াত করে এবং তাকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে, তা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বাণী, অন্য কারো বাণী নয়, যদিও বান্দাগণ তা স্বীয় যের, যবর, পেশ ও নিজ কণ্ঠে তিলাওয়াত করে এবং তারা তা অন্যের কাছে পৌঁছায়। কারণ, কালাম তার বলে ধরা হয় যে প্রথমে তা বলে। কালাম তার হয় না যে পৌছানোর জন্য বা উচ্চারণের উদ্দেশ্যে বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ ٦﴾ [التوبة: ٦]

“যদি মুশরিকদের মধ্যে হতে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহ তা‘আলার বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও”। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬]

এটিই কুরআন যা গ্রন্থকারে সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ٢٢﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]

“বরং এটি কুরআন মাজীদ, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে”। [সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ২১-২২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ ٢ فِيهَا كُتُبٞ قَيِّمَةٞ ٣﴾ [البينة: ٢، ٣]

আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এক রাসূল যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র গ্রন্থ। যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে”। [সূরা-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ২-৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٨]

“নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত আছে”। [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৭৭-৭৮]

আল-কুরআন তার বর্ণ, ছন্দ ও অর্থে আল্লাহ তা‘আলার বাণী। সবই কুরআন ও আল্লাহর বাণীর অন্তর্ভুক্ত। হরফের শেষের যের, যবর, পেশ, তানভীন, সাকিন হরফেরই পূর্ণতা। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات»

“যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করল তার শেষ বর্ণের ধ্বনি (যাবার, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) উচ্চারণ করে পড়ল, প্রতিটি হরফের জন্যে তার দশটি করে পুণ্য রয়েছে”।[58]

আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, কুরআনের ই‘রাব (যাবার, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) সংরক্ষণ করা কুরআনের কোনো কোনো হরফ (সাত হরফে নাযিল হওয়ার কোনো একটি হরফ) সংরক্ষণ করার চেয়ে আমার নিকট উত্তম।

মুসলিমগণ যদি স্বরচিহ্ন (নুকতা ও যের, যাবার ও পেশ) বিহীন কুরআন লিপিবদ্ধ করতে পছন্দ করে, তাহলে তা বৈধ। যেমন, সাহাবীগণ নুকতা ও হারাকাত বিহীন মাসহাফ লিপিবদ্ধ করেছেন। কেননা, তারা ছিলেন আদি আরবী ভাষী। আরবী ভাষাগত কোনো ভুল তাদের ছিল না। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কুরআনের যে কপিটি তাবে‘ঈনদের যুগে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলে তাও ছিল অনুরূপ।

অতঃপর তাতে জনগণের তিলাওয়াত ভুল পরিলক্ষিত হয়। তখন প্রয়োজনের দাবীতে আল কুরআনের সংকলিত গ্রন্থাবলী স্বরচিহ্নের (নুকতা, যের, যাবার ও পেশ) দ্বারা হারাকাত দেওয়া হয়। তারপর বর্ণের ওপর আধুনিক স্বরচিহ্ন প্রদান করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলেমদের থেকে এ বিষয়ে মতবিরোধ বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এটি বিদ‘আত। কেউ কেউ বলেছেন যে, মাকরূহ হবে না, প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণে। অপর

---

[58] বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস, নং ৫৩৩

দিকে কেউ কেউ ই'রাব বর্ণনার সুবিধার্থে হারাকাত দেওয়া পছন্দ করেছেন কিন্তু নুকতা দেওয়া অপছন্দ করেছেন।

সহীহ কথা হলো এতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই।

- শব্দ যে আল্লাহর বাণীর অংশ এর সত্যায়ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীস, যাতে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা শব্দ আকারে কথা বলেছেন। আদম আলাইহিস সালামকে সশব্দে ডেকেছেন। (যখন শব্দ প্রমাণিত হয় তখন তো স্বরচিহ্ন অবশ্যই প্রমাণিত।[59]) হাদীসে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ বিদ্যমান। এটিই হলো পূর্বসূরি আলেম সমাজ ও আহলে সুন্নাহর আক্বীদার সারাংশ।
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কালাম মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়। চাই তা পঠিত হোক বা লিখিত হোক। বান্দার কুরআন তেলাওয়াতকে মাখলুক বলা যাবে না। কারণ, তাতে অবতীর্ণ কুরআন প্রবিষ্ট। আর এও বলা যাবে না যে, তা মাখলুক নয়। কারণ, তাতে বান্দার কর্ম প্রবিষ্ট। পূর্বসূরী ইমামদের কেউ এ কথা কখনো বলেনি যে, বান্দার কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ চিরস্থায়ী। বরং যারা এ কথা বলেছেন অর্থাৎ 'বান্দার কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ মাখলুক নয়' তাদের প্রতিবাদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে 'মিদাদ' বা কালি চিরস্থায়ী সে সবচেয়ে বড় মূর্খ ও সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾ [الكهف: ١٠٩]

---

[59] অনুবাদক

“তুমি বল: সমুদ্রগুলি যদি আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার রবের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও এর মতো আরো সমুদ্র আনা হয়”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৯] উপরের আয়াত প্রমাণ করে যে, কালি দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার কথাসমূহ লেখা হয়।

- অনুরূপভাবে যারা বলে, কুরআন মাসহাফে নয়, মাসহাফে যা রয়েছে তা হলো, কালী, কাগজ, বিবরণ ও শব্দগুচ্ছ, তারাও পথভ্রষ্ট ও বিদ‘আতী। সুতরাং কুরআন হলো তা যা আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, আর তা দুইটি গিলাফের মাঝখানে রয়েছে। কালাম মাসহাফেই- যে পদ্ধতিতে মানুষ তাকে কুরআন বলে জানে -তার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যদ্বারা অন্য সব বস্তু থেকে তা স্বতন্ত্র।
- অনুরূপভাবে যে সুন্নাতের ওপর বাড়াবাড়ি করে এবং বলে, বান্দার শব্দ ও তার আওয়াজ স্থায়ী, সেও গোমরাহ ও বিদ‘আতী। যেমন ঐ ব্যক্তি যে বলে, আল্লাহ তা‘আলা শব্দ ও আওয়াজ দ্বারা কথা বলে না। সেও বিদ‘আতী ও সুন্নাহকে অস্বীকারকারী।
- অনুরূপভাবে যে বাড়ায় এবং বলে কালী সর্বপ্রাচীন, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় গোমরাহ যে বলে মাসহাফে আল্লাহর কোনো কালাম নেই।

আর যে সব মূর্খরা এর ওপর বাড়িয়ে এ কথা বলে, কাগজ, চামড়া, কালী ও দেওয়ালের টুকরা আল্লাহর কালাম। সে ঐ ব্যক্তির মতো যে বলে, আল্লাহ তা‘লার কুরআন বলেন নি এবং কুরআন তার বাণীও নয়। কুরআনে কারীম আল্লাহর কালাম সাব্যস্ত করণে এ ধরনের বাড়াবাড়ি ঠিক তার বিপরীতে পন্থীদের নিষেধ করার মতই; যারা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার দিকে

নিষেধ করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। আর উভয় দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বাইরের লোক।

- অনুরূপভাবে আল্লাহর কালামের নুকতা, হারাকাত ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা করে হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক কিছু বলা উভয়টিই বিদ‘আত। এ বিদ‘আতটি (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার সময়কালের) একশ বা তার চেয়ে সামান্য বেশি বছর ধরে আবিস্কার হয়েছে। কারণ, যে বলে যে কালী দ্বারা হরফে নুকতা ও হারাকাত দেওয়া হয়, তা কাদীম বা সর্বপ্রাচীন সে অবশ্যই গোমরাহ ও মূর্খ। আর যে বলে কুরআনের ই‘রাব তথা শেষ শব্দের হারাকাত কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেও গোমরাহ ও বিদ‘আতী।
- বরং কর্তব্য হচ্ছে এটা বলা যে, এ আরবী কুরআন সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। আর তখন যাবতীয় হরফ ও ই‘রাব (শব্দের শেষের) বা হরকাতও সেটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি যাবতীয় অর্থ তার অন্তর্ভুক্ত হবে।
- আরও বলা হবে যে, দু’ গিলাফের মাঝখানে থাকা সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। কারণ, যদি মাসহাফটি নুকতা ও হারাকাত বিশিষ্ট হয় তখন এ কথা বলা যাবে যে, দুই গিলাফের মধ্যে পঠিতব্য কথা সবই আল্লাহ তা‘আলার বাণী। আর যদি নুকতা ও হারাকাত বিহীন লেখা হয়, যেমন পুরাতন মাসহাফ যেটি সাহাবীগণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তখনও এ কথা বলা যাবে যে, দুই গিলাফের মধ্যে পঠিতব্য কথা সবই আল্লাহ তা‘আলার বাণী। সুতরাং মুসলিমদের মাঝে একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করে, তাদেরকে এমন কোনো ফিতনায় জড়ানো জায়েয নেই; যার কোনো বাস্তব উপকারিতা নেই, বরং তা কেবল শব্দগত মতপার্থক্য। কেননা দীনের মধ্যে দলীলবিহীন নতুন কিছু করা জায়েয নেই।

পরিচ্ছেদ

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) সাহাবীগণের বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

সাহাবীগণের ফযীলতের প্রমাণসমূহ:

অনুরূপভাবে সাহাবীগণের বিষয়ে ও রাসূলের আত্মীয়দের ব্যাপারে মধ্যপন্থা ও মধ্যপথ অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর সাহাবীগণের উচ্চ প্রশংসা করেছেন আর তাদেরও প্রশংসা করেছেন যারা ছিল একনিষ্ঠতার সাথে তাদের আনুগত্যকারী-মুসলিম। আল্লাহ তা‘আলা আরো জানিয়েছেন যে, তিনি সাহাবীগণের প্রতি সন্তুষ্ট ও তারাও আল্লাহ তা‘আলার ওপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবের কয়েক স্থানে তাদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। আর তার সঙ্গে যারা আছেন তারা কাফিরদের ওপর বড়ই কঠোর এবং তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল...”। [সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨﴾ [الفتح: ١٨]

“মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে”। [সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ১৮]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তাহলেও সাহাবীগণের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সাওয়াবে পৌঁছতে পারবে না”।[60]

চার খলিফার মধ্যে শ্রষ্টত্বের আলোচনা:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ঐকমতে মুতাওয়াতির সূত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যুর পর উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-ই এর খেলাফত গ্রহণের বায়‘আতের ওপর সাহাবীগণ একমত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا»

“নবুওয়াতী খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। অতঃপর রাজতন্ত্রে পরিণত হবে”।[61]

---

[60] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৪০

[61] আবু দাউদ, হাদীস নং ১২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»

"আমার পর আমার সুন্নাত ও হিদায়েত প্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সুন্নাহ গ্রহণ করা তোমাদের প্রতি অপরিহার্য। তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। আর দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার থেকে দূরে থাকবে। কারণ দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি সবই পথভ্রষ্ট"।

আর আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হিদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সর্বশেষ ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাধারণ মানুষ, আলেম নেতৃবর্গ ও সৈন্যবাহিনী সবাই সাহাবীগণের মর্যাদার বিষয়ে একমত যে, প্রথম স্তরে আবু বকর, তারপর উমার, তারপর উসমান, তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম। এ মর্মে দলীলসমূহ সাহাবীগণের ফযীলত বিষয়ক বহু হাদীস বিদ্যমান। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিবাদ বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা:

তদ্রূপ সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বনের প্রতি আমরা ঈমান পোষণ করি। আমরা আরো অবগত আছি যে, এ মর্মে বর্ণিত বহু কথা আছে যা বানোয়াট। আর কিছু ছিল ইজতিহাদী বিষয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইজতিহাদে (শরী'আত গবেষণায়) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তাদের জন্য রয়েছে দু'টি পুরষ্কার আর ভুল হলে একটি পুরস্কার যা তাদের সৎকর্মে পরিণত হবে। ভুলের জন্য তারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতে তাদের পাপসমূহের ওপর তাদের পুণ্যসমূহ অগ্রবর্তী হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাওবা, বিশেষ পুণ্যাবলী, পাপ

বিমুক্ত হওয়ার বিপদ-আপদ বা অন্য কোনো কিছু দ্বারা তাদের পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ, তারা এ উম্মতের স্বর্ণ যুগের অধিবাসী। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم»

"সবচেয়ে উত্তম যুগ সেই যুগ যে যুগের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তার পরবর্তী যুগ"।[62]

এ উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠতম উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও জানা যায় যে, মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সহযোগী যুদ্ধ বাহিনীর চেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উত্তম ও অধিক সত্যের নিকটবর্তী ছিলেন। যেমন, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»

"মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দল বের হয়ে যাবে। দু'দলের মধ্যে যেটি হকের বেশি কাছাকাছি সেটিকে তারা হত্যা করবে।" এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিবাদমূলক সকল দল হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রকৃষ্ট দলীল। আর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন হকের অধিক নিকটবর্তী"।

পক্ষান্তরে সা'আদ ইবন আবী ওক্কাছ, ইবন উমারসহ অনেকে ফিতনার মধ্যে কোনো একদলে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে বসে ছিলেন। তারা ফিতনার

[62] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩

যুগে সশস্ত্র যুদ্ধ হতে বিরত থাকার অকাট্য দলীলসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ আহলে হাদীস ও আহলে ইলম এর ওপরই সু-প্রতিষ্ঠিত।

আহলে বাইতদের হক:

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-বংশধরের প্রতিও মুসলিম জাতির অধিকার আছে। তাদেরকে দেখাশুনা করা মুসলিম কর্ণধারদের ওপর ফরয। কেননা বিনা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে ধার্য করে দিয়েছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের সময় তার বংশধরকে অন্তর্ভুক্ত করে দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জন্য বলেন, তোমরা বল,

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বংশধরের ওপর সালাত বর্ষণ কর। যেমন তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের ওপর বর্ষণ করেছ, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর। যেমন তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের ওপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।[63]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর তারা যাদের ওপর যাকাত-সদকা খাওয়া হারাম ছিল। ইমাম শাফে'ঈ রহ., আহমাদ ইবন হাম্বল

[63] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০৫

রহ.-সহ অনেকেই এ কথা বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»

“যাকাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের জন্যে হালাল নয়”।[64]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣﴾ [الاحزاب : ٣٣]

“হে নবী পরিবার, আল্লাহ তা‘আলা তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]

মহান আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর যাকাত হারাম করেছেন। কেননা, তা মানুষের ময়লা। কোনো কোন সালাফ বা পূর্বসূরি আলেম বলেছেন, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে ভালোবাসা ঈমান এবং তাদের সঙ্গে ঈর্ষা করা মুনাফিকী। আর বনী হাশিমকে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা নিফাকী-পাপ।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, যখন কতিপয় সম্প্রদায় বনী হাশিমের ওপর অত্যাচার করছিল তখন আব্বাস সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযোগ করলে, তিনি আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

«والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلى»

---

[64] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭২

“হে জন সমাজ! যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমার কারণে তোমরা বনী হাশিমকে মহব্বত না করলে জান্নাতে যেতে পারবে না”।[65]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم»

“আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসমাঈলকে মনোনিত করেছেন, বনী ইসমাইল থেকে বনী কিনানাকে মনোনিত করেছেন। বনী কিনানা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ গোত্র থেকে বনী হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন”।[66]

ফিতনা ও তার প্রভাব:

উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে হত্যার মাধ্যমে ফিতনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এক ও অখণ্ডিত মুসলিম মিল্লাত বিবিধ দলে উপদলে বিভক্ত হল। এক দল উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পক্ষ নিলো এবং তার প্রতি অতি শ্রদ্ধায় সীমালঙ্ঘন করল এবং আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এরা ছিল অধিকাংশ শামবাসী। তারা নির্দ্বিধায় আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি-গালাজ ও তার সঙ্গে চরম ঈর্ষা শুরু করল।

অপর দিকে অধিকাংশ ইরাকবাসী আলীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পক্ষ গ্রহণ করল এবং আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করল, উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তার সঙ্গে বিরোধের পাহাড় ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে উঠল, তাকে গালি-গালাজ দেওয়া শুরু করল। এভাবে এ ফিরকাবন্দী ও বিদ‘আত প্রকট আকার ধারণ করল। এরা

[65] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৪

[66] মুসলিম, হাদীস নং ২২৭৬

শেষ পর্যন্ত আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে গালি দেওয়া শুরু করল। ফলে সেদিন এটি বৃহত্তর বিপদ রূপে প্রকাশ পেল।

সুন্নাহ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শ হলো উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয়কে মহব্বত করা। আর আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে তাদের দু'জনের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া। তারা দু'জন এ জন্যে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য যে, তাদের দুইজনকে মহান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ গুণে বিশেষিত করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে দলাদলি ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষেধ করেছেন।

এটি এমন স্থান যেখানে ঐক্যের ওপর অটুট থাকা ও আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে সু-দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা মুমিনের ওপর ওয়াজিব করেছেন। কারণ, ইলম, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণের ওপরই সুন্নতের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

যারা সাহাবীগণের গাল দেয় তাদের শাস্তি:

অতঃপর যখন রাফিদ্বী সম্প্রদায় সাহাবীগণের গালি গালাজ শুরু করল, তখন আলেমগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যারাই সাহাবীগণকে গালি দিবে তাদেরকেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। তারপরও রাফেদ্বী সম্প্রদায় সাহাবীগণকে কাফির বলা ছাড়াও আরও বহু বাড়াবাড়ি করেছে। আমি ইতোপূর্বে বহু স্থানে তার উল্লেখ করেছি এবং ঐ কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শর'ঈ বিধানও বর্ণনা করেছি। সে সময় ইয়াযিদ ইবন মু'আবিয়ার বিষয়ে কেউই কোনো কথা উপস্থাপন করে নি। তার বিষয়টি দীনী কোনো আলোচনার বিষয়ও ছিল না। পরবর্তীতে তার বিষয়ে বহু কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো দল তাকে প্রকাশ্যে অভিসম্পাত প্রদান করেছে। হয়তো এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের অভিশাপের দরজা খুলে দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত কাউকে নির্দিষ্টভাবে অভিসম্পাত করা কখনো পছন্দ করেন নি। সুন্নতের প্রতি আজ্ঞাবহ কতক মুসলিম (আহলে সুন্নাত কর্তৃক) লা‘নত না করার বিষয়টি জানতে পেরে মনে করল ইয়াযিদ ছিল অনেক বড় নেককার ও হিদায়েতের বিশেষ ইমাম। (অথচ এটা তাদের ভুল ধারণা)

বস্তুত ইয়াযিদের বিষয়ে দুই দিক থেকে বিপরীত মুখী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে অর্থাৎ একদল তার সম্পর্কে বলে, কাফির, দীন-চ্যুত মুরতাদ। কারণ, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতীকে হত্যা করেছে, তার নানা উত্বাহ ইবন রাবী‘আহ ও তার মামা ওয়ালিদসহ যাদেরকে কাফির মনে করে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি আনসার ও তার বংশধরকে হাররা নামক স্থানে হত্যা করেছে, প্রকাশ্য মদ খাওয়া, দিবালোকে গর্হিত কার্যাবলী সম্পাদন সহ নানা অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন বলে তারা উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে প্রশংসাকারীগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুপথ প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক ন্যায়পরায়ণ নেতা ছিলেন। তিনি সাহাবী বা শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীগণের অন্যতম একজন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার ওলীদের বিশেষ একজন। কখনো কখনো কেউ এও বিশ্বাস করতো যে তিনি নবীদের একজন ছিলেন। তারা আরো বলেছেন যারা ইয়াজিদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখবেন।

তারা শাইখ হাসান ইবন আদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াজিদ এ রূপ এ রূপ মহাগুণের অধিকারী মহান অলী ছিলেন। যারা ইয়াজিদের সমালোচনা থেকে বিরত হবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। শাইখ হাসানের সমকালীন ঐসব ভক্তরা মহামান্য শাইখ আদীর মতের

বিরুদ্ধে তার ও ইয়াজিদের বিষয়ে তারা বহু ভ্রান্ত কবিতা, বাড়াবাড়িমূলক বহু রচনাবলী তার নামে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা শাইখ ‘আদি ও ইয়াযিদ বিষয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যা শাইখ ‘আদি যে মতের ওপর ছিলেন তা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। তার বিরুদ্ধে যে সব অপবাদ দেওয়া হয়, তা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার মধ্যে এ ধরনের কোন বিদ‘আত ছিল না, যার অপবাদ তারা রটিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি রাফেজীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাদের রোষানলে পড়েন। তারা শাইখ হাসানকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। মুসলিম জাহানে ফিতনার কালো ছায়া নেমে আসে যা আল্লাহ ও তার রাসূল কখনো পছন্দ করেন নি।

এ হলো ইয়াজিদের বিষয়ে দু’দিক থেকে বিপরীতমুখী বাড়াবাড়ির সংক্ষিপ্ত ভাষা চিত্র। ইয়াযিদ সম্পর্কে উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধি এ ধরনের বাড়াবাড়ি মুসলিম সমাজ ও আলিমদের ঐক্যমতের সম্পূর্ণ বিরোধী কার্যকলাপ।

কেননা, ইয়াজিদ ইবন মু‘আবিয়াহ উসমান ইবন ‘আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফতে জন্ম গ্রহণ করে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পান নি। আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী তিনি সাহাবী ছিলেন না। দীন ও যথাযোগ্য কাজের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি মুসলিম যুবকদের একজন একজন ছিলেন। কাফির দীন-চ্যুৎ মুরতাদ ছিলেন না। তার পিতার মৃত্যুর পর কিছু সংখ্যক মুসলিমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং কিছু সংখ্যক মুসলিমদের সম্মতিতে তিনি মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তার ছিল বহু বীরত্ব ও সুমহান বদান্য, তিনি প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন না। যেমন কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীরা বর্ণনা করে থাকে।

তার শাসন আমলের কতক বড় বড় ঘটনা:

এক. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হত্যা কার্য তার অন্যতম। তিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে হত্যার নির্দেশ দেন নি এবং তার হত্যার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তার সম্মানহানি করে দন্তের উপর লাঠির আঘাত করে ঠাট্টা বিদ্রূপও করেন নি। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মস্তক শাম এ নিয়ে যেতেও নির্দেশ দেন নি। তাকে হত্যার কারণে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন নি; বরং তিনি হুসাইনকে বাধা প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তার কর্মকে প্রতিহত করতে নির্দেশ দেন তাতে যদি যুদ্ধ করা লাগে তবুও। ইয়াজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী ও প্রতিনিধি তার নির্দেশের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। সামর ইবন জুল জাওশান সৈন্যদলকে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নেতৃত্বে তাকে হত্যার জন্য উৎসাহিত করেছে। ফলে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ তার প্রতি সীমালঙ্ঘন করেছিল। তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে ইয়াজিদ এর নিকট নিয়ে যাওয়া অথবা প্রহরারত অবস্থায় সুরক্ষিত সীমান্ত শহরে পাঠানো বা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে তাদের নিকট আবেদন করেছিলেন। তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। সে উমার ইবন সা‘আদকে নির্দেশ দেন সে যেন হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে তারা তাকে ও তার পরিবারের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তার হত্যাকাণ্ড ছিল ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। কেননা, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার পূর্বে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কে হত্যা করা এ উম্মতের ভয়াবহ ফিতনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাদের দুজনকে তারাই হত্যা করেছে যারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব।

তারপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পরিবারবর্গ যখন তার দরবারে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং

তাদেরকে সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে ছিলেন। ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি হুসাইন এর হত্যার জন্য উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে অভিসম্পাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি ইরাকের অনুসারীদের বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম শুধুমাত্র হুসাইনের হত্যা ছাড়া। তা সত্ত্বেও তিনি তার হত্যার কোন প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন কর্ম তার থেকে প্রকাশ পায়নি। তার হত্যার প্রতিশোধ ও বদলাও নেননি অথচ এটা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। তাই হক পন্থীরা তার অন্যান্য কার্যকলাপের সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব পরিত্যাগ করার সমালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তার সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করে, তারা তার ওপর বহু মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়।

আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো, মদীনাবাসীগণ তার সঙ্গে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পর তা ভঙ্গ করেছিল, তার প্রেরিত প্রতিনিধিকে পরিবারসহ সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি একটি সৈন্যদলকে এ মর্মে প্রেরণ করেন যে, মদীনাবাসীর নিকট তারা আনুগত্য কামনা করবে, এতে যদি তারা সম্মত না হয় তাহলে তারা তিন দিন পর্যন্ত তাদের বুঝার সুযোগ দিবে। তারপর বাধা দিলে তারা অস্ত্রের সাহায্যে মদিনায় প্রবেশ করবে। তিন দিন পর তাদের রক্তকে তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করবে। নির্দেশ মোতাবেক সৈন্যদল তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় অপেক্ষায় ছিল। তারপর তারা গণহত্যা শুরু করে, লুটতরাজ আরম্ভ করে, হারাম-কৃত মহিলাদেরকে জোর পূর্বক যৌন-ক্রিয়ার পাত্রে পরিণত করে। তারপর সে অপর একটি সৈন্য বাহিনীকে মক্কায় প্রেরণ করে, তারা মক্কা অবরোধ করে। ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত তারা মক্কা অবরোধ করে রেখেছিল। এ ছিল ইয়াজিদের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত চিত্র যা তার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো তাকে গালিও দিবে না ভালোবাসবেও না।

ছালিহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম, জনগণ বলে, তারা ইয়াজিদকে ভালোবাসে। তিনি বললেন, হে আমার বৎস, যে আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে কি ইয়াজিদকে ভালবাসতে পারে! আমি বললাম, হে আমার বাবা! তাহলে আপনি তাকে অভিসম্পাত করেন না কেন? তিনি বললেন, হে আমার বৎস্য! তুমি কি কখনও তোমার বাবাকে কারো প্রতি অভিশাপ দিতে দেখেছ?

তার কর্তৃক বর্ণিত আছে- তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়াজিদ ইবন মু‘আবিয়া কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি জবাবে বললেন, না। ইসলামে তার কোনো সম্মানিত স্থান নেই। সে কি ঐ ব্যক্তি নয় যে মদিনাবাসীর ওপর এই এই অপকর্ম ও অত্যাচার করেছিল?

মুসলিম নেতৃবর্গ আলিমদের নিকট ইয়াজিদ হলো রাজতান্ত্রিক বাদশাহদের অন্যতম। আল্লাহ তা‘আলার অলী ও সৎ মানুষদের মতো তারা তাকে ভালোবাসেন না। তাকে তারা গালিও দেন না। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট মুসলিমকে অভিশাপ দেওয়া তারা পছন্দ করেন না। কেননা, ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি যাকে হিমার (গাধা) বলা হতো। সে খুব বেশি মদ পান করত। আর যখন মদ খেত তখন আল্লাহ তা‘আলার রাসূলের নিকট আনা হতো এবং মদ পানের শাস্তি স্বরূপ তাকে প্রহার করা হতো। একবার এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তা‘আলা তোমার প্রতি অভিশাপ করুন! কারণ, তুমি বারবার আল্লাহ তা‘আলার নবীর নিকট এ অপরাধ নিয়ে আস। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন,

«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»

"তাকে অভিশাপ করো না। কারণ, সে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে"।[67]

তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাহর একদল লোক তাকে অভিশাপ করা বৈধ মনে করেন। কেননা, তারা বিশ্বাস করেন তিনি এমন নির্মম অত্যাচার করেছিলেন, যে অত্যাচার করার কারণে সে অত্যাচাকারীকে অভিশাপ করা যেতে পারে।

অপর দল তাকে মহব্বত করা পছন্দ করেন। কারণ, সে একজন মুসলিম। সাহাবীগণের যুগে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সাহাবীগণ তার আনুগত্যের বায়'আত নিয়েছিলেন। তারা বলেন, তার বহু কল্যাণময়ী কাজও ছিল। অথবা তিনি যা করেছিলেন তাতে তিনি একজন মুজতাহেদ ছিলেন।

সঠিক কথা হল, যার প্রতি মুসলিম ইমামগণের মতামত প্রতিষ্ঠিত, তা হলো তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসারও দরকার নেই এবং তাকে অভিসম্পাত করাও যাবে না। তারপরও যদি সে যালিম ও ফাসিক হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যালিম ও ফাসিককে ক্ষমা করে দেন। বিশেষ করে যখন সে কোন মহান কাজ করে থাকে। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম যে দল কুসতুন্তনিয়্যা (কনস্টান্টিনোপল) যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। আর ঐ স্থানে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়াজিদ ইবন মু'আবিয়ার নেতৃত্বে। আবু আইয়ুব আনসারীও রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সঙ্গী ছিলেন।

অবশ্য ইয়াজিদ ইবন মু'আবিয়া ও তার চাচা ইয়াজিদ ইবন 'আবী সুফিয়ান দুইজনের নাম এক হওয়ার কারণে সংশয় দেখা দেয়। ইয়াজিদ ইবন আবু সুফিয়ান হলেন সাহাবী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি

---

[67] আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৪

হারব কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। শাম এর আমীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম যাদের আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু শাম বিজয়ের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বিদায় কালীন তার উষ্ট্রবাহন ধরে হেঁটে হেঁটে অসীয়ত করছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূলের প্রতিনিধি! তুমি আরোহণ করবে নাকি আমি অবতরণ করবো? তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, আমি আরোহী হবো না আর তুমি অবতরণকারী হবে না। আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় আমার জীবনের পাপরাশি শেষ হয়ে যাক।

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফত আমলে শাম বিজয়ের পর যখন তিনি মারা যান, তখন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- তার ভাই মু'আবিয়াকে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তারপর উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- এর খিলাফত আমলে ইয়াজিদের জন্ম হয়। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- শামে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং তারপর যা ঘটার তা ঘটে গেল।

ওয়াজিব হলো এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইয়াজিদ ইবন মু'আবিয়ার সমালোচনার দ্বারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষায় ফেলা থেকে বিরত থাকা। কারণ, এরূপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের পরিপন্থী। এ সব বিভ্রান্তির ফলে কতিপয় জাহিল মনে করে ইয়াজিদ ইবন মু'আবিয়া শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীগণের অন্যতম এবং ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ইমাম। অথচ এটি সুস্পষ্ট ভুল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আরও একটি আকীদা হলো)

কোনো একটি দলের প্রতি সম্বোধন করে উম্মতের মধ্যে বিভক্তি জায়েয নেই: মুসলিম সমাজে দলাদলি সৃষ্টি করা এবং মানুষকে সেই বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলানো, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দেশ দেন নি তা জায়েয নেই। যথা- কোনো ব্যক্তিকে বলা তুমি শাকীলী, তুমি কিরফিন্দী (তথা তুমি আমার পন্থী, আমার কর্মী বা আমার দলের, আর অমুক অন্য দলের)। কেননা, এই সব পরিভাষা বাতিল। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ তা'আলার কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও পূর্ববর্তী সাহাবীগণের কোনো গ্রহণযোগ্য আসারেও (সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আসার বলে) অমুক শাকীলী, অমুক কিরফিন্দী ইত্যাদি বিদ্যমান নেই; বরং মুসলিমের ওপর ফরয হলো যখন তাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কে? তখন আপনি বলবেন আমি কোনো সাকীলী বা কিরফিন্দী নই। আমি কেবলমাত্র আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী একজন মুসলিম।

এ ক্ষেত্রে মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান-এর বর্ণিত হাদীসটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তিনি একদা বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, আপনি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দলে নাকি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দলে? তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন আমি আলীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- দলেও নই এবং উসমানের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- দলেও নই; বরং আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলের অনুসারী।

এভাবে প্রত্যেক পূর্ববর্তী আলেম বা সালাফগণ বলেছেন- এ সব দলাদলির শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। তাদের মধ্যে জনৈক আলেম বলেন, দু'টি মহা নি'আমত অবলম্বনের ব্যাপারে আমি কোনো পরওয়া করি না।

এক- আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দিকে আমাকে পরিচালিত করেছেন।

দুই- এ সব দলাদলি থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে আমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মুমিন ও ইবাদুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যে নাম দিয়েছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। নব আবিষ্কৃত মানুষের তৈরি দলীয় নাম যা তারা ও তাদের পূর্ব পুরুষগণ রেখেছেন, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি বরং এসব নামসমূহ দ্বারা নামকরণ করার অবকাশ যে সব ক্ষেত্রে রয়েছে, যেমন মানুষকে ইমামের দিকে সম্বোধন করা। যথা- হানাফী, মালেফী, শাফে'ঈ, হাম্বলী অথবা কোনো শাইখের দিকে সম্বোধন করে বিভিন্ন তরীকার নাম রাখা। যথা- কাদিরী (নকশবন্দি) ও আদওয়ী শাইখের তরিকাপন্থী অথবা কোনো গোত্রের দিকে সম্বোধন করে বিভিন্ন গোত্রের নামকরণ করা। যথা- কাইসী গোত্র ও ইয়ামানী গোত্র, অনুরূপ বিভিন্ন জাতীয়তার নাম করা। যথা- শামী, ইরাকী, মিশরী ইত্যাদি। এগুলোর দিকে সম্পর্কযুক্ত করে নাম দেওয়া জায়েয হলেও কোনো মুসলিমের জন্যে বৈধ নয় যে, সে উপরোক্ত দলের ভিত্তিতে কোনো মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে, আর এসব নামের ভিত্তিতে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে বা মৈত্রী স্থাপন করবে এবং তারই ভিত্তিতে শত্রুতা পোষণ করবে; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন, তাদের মধ্যে তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিবর্গ। তারা যে কোনো দলের হোক না কেন।

ওলী হওয়া ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়:

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরাই হলো আল্লাহ তা‘আলার অলী। আর তারা হলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের কারীমে সংবাদ দেন যে, তার অলী হলো, তাকওয়া অবলম্বনকারী মুমিনগণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۝٦٣ ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

“জেনে রেখো! আল্লাহ তা‘আলার বন্ধুদের জন্যে কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩]

তারপর আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতে মুত্তাকী কারা তার সংজ্ঞা প্রদান করেন,

﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ۝١٧٧﴾ [البقرة: ١٧٧]

“তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও এতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ তা‘আলা, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকিন, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদের এবং মানুষদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য দান করবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্যের সময় ও

দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করবে, মূলতঃ এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুত্তাকী”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭]

তাকওয়ার সংজ্ঞা: তাকওয়া হলো আল্লাহ তা‘আলা যা আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার ওলীদের অবস্থা ও ওলী হওয়ার মাধ্যমগুলো বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصربه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه»

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরয করে দিয়েছি তার দ্বারা কোনো বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকলে অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে

তা অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোনো দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মুমিনের মৃত্যু সম্পর্কে, কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি”।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের স্তর হলো দু’টি।

এক- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা।

দ্বিতীয়ত- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের পর নফল আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা।

প্রথমটি হলো ডানপন্থী পুণ্যবান সত্যপন্থীদের স্তর। দ্বিতীয়টি হলো অগ্রগামী নৈকট্য অর্জনকারীদের স্তর। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٢٢ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٢٣ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ ٢٤ يُسۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ مَّخۡتُومٍ ٢٥ خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ٢٦﴾

[المطففين: ٢٢، ٢٧]

“পুণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নি‘আমতের মাঝে। উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদেরকে পান করানো হবে ছিপি-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়। তার ছিপি হবে মিশকের, প্রতিযোগিরা যেন এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক”। [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ২২-২৬]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, ডানপন্থীদের জন্য মিশ্রিত করা হবে আর নৈকট্য লাভকারীরা সেখানে (নেশা মুক্ত) খাঁটি শরাব পান করবে।

একই অর্থবোধক কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে; তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ওলীদের অন্তর্ভুক্ত।[68]

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার স্বরূপ:

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের বিরোধিতা করা মুমিনের ওপর ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُواْ خَٰسِرِينَ ٥٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٥٦﴾ [المائدة: ٥١، ٥٦]

---

[68] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٤﴾ [يونس: ٦٢، ٦٤]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنۡ أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ﴾ [الانفال: ٣٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করিও না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তদেরকে দেখবে সত্বর তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান মুশরিকদের) মাঝে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। হয়তো আল্লাহ তা‘আলা বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে। মুমিনগণ বলবে, এরা কি তারাই যারা আল্লাহ তা‘আলার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে। তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দীন হতে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ তা‘আলা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন আর তারাও তাকে ভালবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ তা‘আলার পথে যুদ্ধ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না, এটা আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ-যাকে ইচ্ছে তিনি দান করেন এবং আল্লাহ তা‘আলা প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু আল্লাহ তা‘আলা, তার রাসূল ও মুমিনগণ যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা‘আলার কাছে অবনত হয়। যে কেউ আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধরূপে গ্রহণ করবে সে দেখতে পাবে যে আল্লাহ তা‘আলার দলই বিজয়ী হবে। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫১-৫৬]

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুমিনের বন্ধু হলো আল্লাহ তা‘আলা, তার রাসুল ও তার প্রতি ঈমানদার বান্দাগণ। এ বিশেষণটি প্রতিটি মুমিন যে এ

গুণে গুণান্বিত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চাই সে তার বংশের, দেশের, মাযহাবের অথবা স্বীয় দলভুক্ত হোক বা না হোক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾ [التوبة: ٧١]

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٧٤ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥﴾ [الانفال: ٧٢، ٧٦]

"যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব তোমার ওপর নেই, তবে তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু তোমাদের ও যে জাতির মধ্যে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন। আর যারা কুফরি করে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা [মুমিনদের

পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা] না কর তবে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহা-বিপর্যয় দেখা দিবে। যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছে- তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে আর তোমাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৭২-৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩﴾ [الحجرات: ٩]

"মুমিনদের দু'দল লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করবে আর সুবিচার করবে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-বিচারকারীদের ভালোবাসেন"। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ৯]

সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»

“পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনের উদাহরণ হলো এক ও অখণ্ডিত দেহ। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্যে বিনিদ্র ও ব্যথায় আক্রান্ত হয়”।[69]

সহীহ হাদীসে অনুরূপ আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»

“একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। যার একাংশ অপর অংশকে সু-দৃঢ় করে। অতঃপর তিনি একহাতের অঙ্গুলিগুলো অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করালেন”।[70]

অনুরূপ সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত আছে,

«والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»

“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপরের জন্য তা-ই ভালো না বাসে”।[71]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»

“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে (বিপদের সময়) অন্যের নিকট সোপর্দ করতে পারে না ও তার প্রতি অত্যাচারও করতে পারে না”।[72]

[69] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৮

[70] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮২

[71] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২

[72] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৭৮

কুরআন ও হাদীসে এরূপ বহু দলীল বিদ্যমান, যাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কথা বলা হয়েছে।

এরই ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এক মুমিন অপর মুমিনের বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। একে অপরকে সাহায্যকারী, অনুগ্রহকারী ও দয়াশীল হিসেবে পরিণত করেছেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলাদলি ও মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ١٠٣﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে সু-দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়ো না”। [আল আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ١٥٩﴾ [الانعام: ١٥٩]

“নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে, তাদের কোনো কাজের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আলার ওপর ন্যস্ত”। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৯]

বড়ই পরিতাপের বিষয়! কীভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের লোকেরা বিভিন্ন দল ও বিবিধ মতভেদে বিভক্ত হয়েছে। দলের স্বার্থেই কেবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান ও প্রবৃত্তির চরিতার্থে কোনো লোক এক দলকে ভালোবাসে ও অপর দলকে শত্রু মনে করে অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ মর্মে কোনো প্রমাণ তাদের নিকট নেই।

অথচ আল্লাহ তা‘আলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন, যারা এ ধরনের দলাদলিতে লিপ্ত হবে।

বস্তুত এ সব তো খারেজীদের ন্যায় বিদ‘আতী দলের কর্ম যা মুসলিমদের এক ও অখণ্ডিত জামা‘আতকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের ভিন্নমত পোষণকারীদের রক্তপাত করাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত আল্লাহ তা‘আলার রজ্জু (কুরআন ও সুন্নাহ)-কে সু-দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। এ সব কাজ তারা করে না।

যারা এসব দলাদলি করে থাকে, তাদের সেখানে সর্বনিম্ন ক্ষতি তো এটা ধরে নেওয়া যায় যে, কোনো লোক সেখানে কেবল নিছক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাউকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে, যদিও সে অপর লোকটি তার থেকে আরও বেশি তাকওয়ার অধিকারী।

অথচ ওয়াজিব হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলকে অগ্রাধিকার দেয় তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলের অনুসরণের বিষয়ে পশ্চাতে রয়েছে তাকে পিছিয়ে রাখা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলকে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলের সাথে শত্রুতা করে তার সঙ্গে শত্রুতা করা, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল যা নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে সে নির্দেশই দেওয়া, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছেন সে সব বিষয়েই নিষেধ করা, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল যাতে খুশী থাকেন তাতেই খুশী থাকা। মুসলিমগণ হবেন একটি মহাশক্তি। কিভাবে তা সম্ভব যে, একজন মুসলিম ভাইয়ের বিরোধিতা করতে করতে তাকে কাফের বা গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করে। অনেক সময় এমনও হতে পারে সত্য তার সাথেই রয়েছে

এবং সে-ই কিতাব ও সুন্নাহের অনুসারী। যদি তার মুসলিম ভাই কোনো বিষয়ে ভুলই হয়তো করে বসল; কেননা কেউ ভুল করলেই সে কাফির বা ফাসিক হয়ে যাবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের ত্রুটি ও ভুলে যাওয়া জনিত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে মুমিন ও রাসূলগণের দো'আ প্রসঙ্গে বলেছেন-

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"হে আমাদের 'রব'! আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুল করি কিংবা ভুলে যাই"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দো'আর উত্তরে বলেছেন, "আমি তাই করলাম।"

বিশেষ করে কখনো সময় দেখা যায়, যে তোমার সাথে একমত পোষণ করেছে, সে ইসলামের বিশেষ একটি অবস্থানে রয়েছে। যেমন, তোমাদের একজন শাফে'ঈ রহ. মাযহাবের অনুসারী অথবা শেখ 'আদী রহ.-এর অনুসারী। তারপর সে কোনো একটি বিধানে তাদের বিরোধিতা করছে এবং হতে পারে সত্য ও সঠিক বিষয়টি তার সাথেই রয়েছে, তখন কীভাবে শুধু এ কারণে তার জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানকে হালাল মনে করা হবে বা লুণ্ঠন করা হবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা একজন মুমিনের জান-মালের হিফাযত করাকে মুসলিম ও মুমিনের দায়িত্ব-কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন নতুন নতুন আবিষ্কৃত নাম যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহের কোথাও নেই সেগুলোকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্ত কীভাবে বৈধ হতে পারে?

জামা'আত রহমত আর বিভক্তি আযাব:

এ ধরনের দলাদলি ও বিভক্তি যা মুসলিম উম্মাহ ও তাদের আলেম, পণ্ডিত, আমীর ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এর ফলশ্রুতিতেই শত্রুদের তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর অন্যতম কারণ হল, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের আনুগত্য করা ছেড়ে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ﴾ [المائدة: ١٤]

"আর যারা বলে 'আমরা খ্রিস্টান' আমরা তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম। অনন্তর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারাতে বসেছে। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১৪]

যখনই মানুষ আল্লাহ তা'আলার কতক বিধান পরিত্যাগ করেছে, তখনই তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা এবং কাটাকাটি দেখা দিয়েছে। আর যখন জাতি বিভিন্ন দল, সংগঠন ও পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে, তখনই তারা বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলায় পতিত হয়েছে। আর যখনই তারা একটি দলে সমবেত হয়েছে, তখনই তারা সংশোধন হয়েছে ও অহীর বিধানে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। কেননা এক দলে থাকে রহমত। বিভক্ত হওয়া, দলাদলি করা ও মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভালো কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়া:

আর একতাবদ্ধতা ও ঐক্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বাধা দেওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ۝١٠٢ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ۝١٠٣ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٢، ١٠٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মরিও না। আর তোমরা এক যোগে আল্লাহ তা‘আলার রুজ্জু দৃঢ় ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার যে নি‘আমত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তারপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন; এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের স্বীয় নিদর্শনা বলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে তারাই সুফল প্রাপ্ত”। [আল আলে ইমরান, আয়াত: ১০২-১০৪]

সৎ কাজের আদেশ দ্বারা ঐক্য ও একতাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর মতবিরোধ ও দলাদলি বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অসৎ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দ্বারা যারা আল্লাহর দেওয়া শরী‘আতের পাবন্দি থেকে বের হয়ে গেছে তাদের তাদের ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মানুষ সম্পর্কে এ বিশ্বাস করে যে, সে ইলাহ অথবা কোনো মৃত ব্যক্তিকে বিপদ-আপদে ডাকে অথবা তার কাছে রিযিক চায়, সাহায্য চায় এবং হিদায়াত চায় অথবা তার ওপর ভরসা করে, তাকে সাজদাহ করে, তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে, যদি তাওবা করে ভালো, না হয় তাকে হত্যা করা হবে।
- আর যে ব্যক্তি কোন ওস্তাদ বা পীর-মাশাইখকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রাধান্য দেয় অথবা এ বিশ্বাস করে যে, কোনো পীর মাশাইখের অনুকরণ করার ফলে রাসূলের অনুকরণ করার প্রয়োজন পড়ে না। তাকেও তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে ভালো, না হয় তাকে হত্যা করা হবে।
- অনুরূপভাবে কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ওলীগণের কেউ কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (নবুওয়তের বা বেলায়েতের) অংশীদার। যেমনটি ছিল মূসা আলাইহিস সালামের সাথে খিযির। তার থেকেও তাওবা তলব করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কারণ, খিযির মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতের কেউ ছিল না। তার ওপর মূসা আলাহিস সালামের অনুকরণ করা ওয়াজিবও ছিল না; বরং সে তাকে বলেছিল, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইলমের এমন এক ইলমের ওপর আছি যা আমার আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন তুমি তা জান না। আর তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইলমের এমন এক ইলমের ওপর আছ যা তোমাকে তোমার আল্লাহ শিখিয়েছেন, আমি তা জানি না। আর মূসা আলাইহিস সালাম প্রেরিত ছিল শুধু বনী ইসরাঈলের নিকট। যেমন, মূসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»

“নবীগণ তাদের জাতির নিকট বিশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়, আর আমি সমস্ত মানুষের নিকট প্ররিত হয়েছি”।

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ও জিন্ন উভয় জাতীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, কারো জন্য তার আনীত শরী‘আত থেকে বের হওয়া ও তার অনুকরণ থেকে বের হওয়ার অবকাশ রয়েছে, সে অবশ্যই কাফির; তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কোনো বিদ‘আত আবিষ্কার করে সেটার ভিত্তিতে কোনো মুসলিমকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে বা তাদের জানমালকে হালাল মনে করে, তাকে তা হতে বিরত রাখা ওয়াজিব এবং তাকে শাস্তি দিয়ে তা থেকে বাধা দিতে হবে। যদিও তাকে হত্যা করা বা তার সাথে যুদ্ধ করা লাগে। কারণ, যখন সব সীমালঙ্ঘনকারী গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনা হবে এবং সব মুত্তাকী গোষ্ঠীকে সম্মান করা হবে, তখন তা হবে সবচেয়ে মহান কাজ; যাতে আল্লাহ ও তার রাসূল খুশি হয় এবং মুসলিমদের যাবতীয় কর্ম সঠিক হয়।

ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা দায়িত্বশীলদের কাজ:

- দায়িত্বশীল অর্থাৎ যারা প্রত্যেক গোত্রের আলেম, নেতৃত্ব দানকারী শাসক ও মাশায়েখ, তাদের ওপর ওয়াজিব হলো, তারা সর্বসাধারণকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। ফলে তারা আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছে, তা পালন করার জন্য

জনসমাজকে নির্দেশ দিবে, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে দূরে থাকার জন্য তাদের নির্দেশ দেবে।

ভালো কাজের প্রকার

প্রথম: শরী‘আতের বিধান:

আর তা হলো, সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, জুমু‘আর সালাত কায়েম করা, নির্ধারিত ওয়াজিব ও সুন্নাত সালাতসমূহ আদায় করা। যথা- দুই ঈদ, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণের সালাত, ইস্তিসকা, তারাবীহ, জানাযা ও অন্যান্য সালাত আদায় করা, অনুরূপ ভাবে শরী‘আত সম্মত সদকা (দান) করা, শরী‘আত নির্ধারিত সাওম পালন করা, বায়তুল হারাম শরীফে হজ সম্পাদন করা।

অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি, তার ফিরিশতাদের প্রতি, তার কিতাবের প্রতি, তার রাসূলদের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। আর ইহসান বিষয়ে ঈমান আনা। আর তা হলো, এমনভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করা যেন সে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাচ্ছে। যদি সে তাকে দেখতে না পায়, তাহলে তিনি অবশ্যই তাকে দেখছেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

অনুরূপভাবে প্রকাশ্য ও গোপনে পালনীয় আল্লাহ ও তার রাসূলের সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। যথা- আল্লাহ তা‘আলার জন্যে দীনকে নির্ভেজাল করা, আল্লাহ তা‘আলারই ওপরে ভরসা করা, সকলের চেয়ে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলকে বেশি ভালোবাসা, আল্লাহ তা‘আলার রহমতের আশাবাদী হওয়া, তার আযাবকে ভয় করা। আল্লাহ তা‘আলার বিধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহ তা‘আলার বিধান বাস্তবায়ন করা। অনুরূপভাবে সত্য কথা বলা, কৃত ওয়াদা পালন করা, যথাস্থানে আমানতসমূহ আদায় করা, বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকীন, মুসাফির, স্বামী-স্ত্রী ও দাস-দাসীর প্রতি ইহসান-সৎ আচরণ করা, কথা ও কাজে ইনসাফ করা, উত্তম চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা। যথা- তোমার সঙ্গে যে আত্মীয় সম্পর্ক রাখতে চায় না তার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা, তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, তোমাদের প্রতি যে যুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٤٢ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣﴾ [الشورى: ٤٠، ٤٣]

“আর খারাপের প্রতিদান হলো অনুরূপ খারাপ। অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং সমঝোতা ও মীমাংসা করে, তার প্রতিদান আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো হলো তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে ও পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪০-৪৩]

মন্দ কর্মের প্রকারভেদ:

আর তা হলো, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল যে সকল মুনকার তথা অন্যায় কাজের নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ তা‘আলার

সাথে শির্ক করা। শির্ক হলো আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকা যথা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের ইবাদাত করা। অথবা পুণ্যবান কোনো ব্যক্তি, ফিরিশতাদের থেকে কাউকে বা নবীদের থেকে কোন নবীকে, জীন সম্প্রদায়ের কাউকে, উপরোক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর মূর্তি, ভাস্কর্য ও তাদের কবরকে আল্লাহর সাথে ডাকা। এ ছাড়াও অন্য কিছু যাদের আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে ডাকা হয়। অথবা তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার জন্যে সাজদাহ দেওয়া হয়। এ সব ও অনুরূপ বস্তুকে ডাকা শিরকের অন্তর্ভুক্ত যে শির্ককে সকল রাসূলের ভাষায় আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে হারাম করেছেন। মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া হারাম করেছেন; চাই তা লুণ্ঠন, সুদের আদান প্রদান ও জুয়া খেলা বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে হোক না কেন। যেমন, ঐ ব্যবসা ও লেনদেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি, কোনো পাপ-খারাপ কাজ ও না হক সীমালঙ্ঘন করাকেও আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

অনুরূপভাবে আরো যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, না জেনে আল্লাহ তা'আলার ওপর কোনো কথা আরোপ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের নামে এমন অকাট্য হাদীস বর্ণনা করা; যার শুদ্ধতা ও অসুদ্ধতা সম্পর্কে সে জানে না। অথবা আল্লাহ তা'আলার এমন সব গুণাবলী বর্ণনা করা যার সম্পর্কে আল্লাহ থেকে কোন কিতাব অবতীর্ণ হয় নি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকেও বিষয়টি জানা যায় নি। চাই তা আল্লাহ তা'আলার জন্যে অশোভন গুণাবলী বা আল্লাহ তা'আলাকে গুণহীন প্রমাণ করার জন্যে হোক না কেন। যেমন করে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা, তারা বলে

থাকে, আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরও নেই, আসমানের উপরও নেই। আর আল্লাহকে আখেরাতেও দেখা যাবে না, তিনি কথা বলবেন না এবং কাউকে ভালোওবাসেন না। এ ধরনের আরো অনেক কথা যা দ্বারা তারা আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলকে অস্বীকার করে। অথবা আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী প্রমাণ করতে গিয়ে সাদৃশ্য বর্ণনার জন্যে হাদীস জাল করা। যেমন বর্ণনা করা যে, তিনি যমীনে চলাচল করেন, সৃষ্ট জীবের উঠ-বস করেন, সৃষ্টি জীবেরা তাকে প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখেন, আসমানসমূহ তাকে বেষ্টন করে ও ঘিরে আছে, তিনি তার সৃষ্টি জীবের মধ্যে বিলিন হয়ে আছেন এরূপ অসংখ্য মিথ্যা রটনা, অপবাদ, মিথ্যাচার আল্লাহ তা‘আলার ওপর আরোপ করা।

অনুরূপভাবে ঐসব ইবাদাত যা নতুন আবিষ্কার করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল শরী‘আতে তার অনুমোদন করেন নি। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ٢١﴾ [الشورى: ٢١]

“তাদের কি কোনো শরীক আছে যারা দীনের বিষয়ে বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে যে বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা কোনো অনুমতি প্রদান করেন নি”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১]

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তার মু’মিন বান্দার জন্যে ইবাদাতসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন। সে ইবাদাত অকেজো করে দেওয়ার জন্যে শয়তান নতুন নতুন ইবাদাতসমূহ আবিষ্কার করেছে, শয়তান তাদের জন্যে সে ইবাদাতের মতই আরো কিছু ইবাদাত তৈরি করেছে। যথা- আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্যে শরী‘আতে নির্ধারিত করেছেন যে, এক আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করবে এবং কাউকে তার সঙ্গে শরীক করবে না। তারপর শয়তান তাদের জন্যে বহু অংশীদার বিধিবদ্ধ করেছে। আর তা হলো আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের

ইবাদাত করা ও তাঁর সাথে শরীক করা। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, তাতে কুরআন পঠন ও শ্রবণ করা প্রবর্তন করেছেন। তাছাড়া তিনি সালাতের বাইরে কুরআন শ্রবণের জন্যে একত্রিত হওয়াও অনুমোদন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রথম যে সূরা অবতীর্ণ করেছেন তাতেও পড়ার কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١﴾ [العلق: ١]

"পড় সেই রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"। [সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১]

এ সূরার শুরুতে কিরাত তথা পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শেষে সাজদাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب۩ ١٩ ﴾ [العلق: ١٩]

"সাজদাহ কর ও তার নিকটবর্তী হও"। [সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১৯]

সেই জন্য সালাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় যিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। আর সবচেয়ে বড় কাজ হলো এক আল্লাহ তা'আলার জন্যে সাজদাহয় অবনত হওয়া, যার কোনো শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨﴾ [الاسراء: ٧٨]

"আর, ফজরের কুরআন তেলাওয়াত, নিশ্চয় ফজরের কুরআন তেলাওয়াত সাক্ষী হয়"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٢٠٤﴾ [الاعراف: ٢٠٣]

"আর, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক যাতে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করা হয়"। [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন তখন তাদের মধ্যে একজনকে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন, বাকীরা শুনতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলতেন, হে আবু মূসা! আমাদের 'রব'-কে আমাদের স্মরণ করিয়ে দাও। তখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন। আর তিনি তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর মনোযোগ সহকারে তার কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يا أبا موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»

"হে আবু মূসা, গত রাতে তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম আর তুমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলে। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তোমার কুরআন তিলাওয়াত উপভোগ করেছি"।

আবু মূসা বলেন, আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন তিলাওয়াত উপভোগ করছেন; তাহলে আপনাকে আমি আরো আনন্দিত করতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لله أشد أذنا إلى الرجل يحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»

"গায়ক তার গানের প্রতি যেভাবে মনোযোগী হয় আল্লাহ তা'আলা একজন কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি, যে কুরআন সুন্দর আওয়ায ও সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে, তার থেকে অধিক মনোযোগী হয়"।[73]

মুমিনদের শ্রবণ ও মুশরিকদের শ্রবণের মধ্যে পার্থক্য:

[73] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৩৪০

এ হলো মুমিনদের শ্রবণ ও পূর্বসূরীদের শ্রবণ ও বড় বড় মাশাইখদের শ্রবণ। যেমন, মা'রূফ আল-কারখী, ফুযাইল ইবন 'আয়ায, আবু সুলাইমান আদ-দারানী প্রমূখ। আর অনূরূপ শ্রবণই ছিল পরবর্তী বড় বড় মাশাইখদের যেমন, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, শাইখ 'আদী ইবন মুসাফির, শাইখ আবী মাদয়ান ও আরো অন্যান্য মাশায়েখগণ।

পক্ষান্তরে মুশরিকদের শ্রবণ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ ٣٥﴾ [الانفال: ٣٥]

"বায়তুল্লাহর নিকট তাদের সালাত ছিল শিষ ধ্বনি ও হাত তালি"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৫]

সালাফগণ বলেন, আল মুকায়া অর্থ শিষ। আর তাসদিয়্যাহ অর্থ করতালি। মুশরিকগণ মসজিদুল হারামে সমবেত হয়ে হাত তালি ও শিষ ধ্বনি, হুইসিল দিত। আর এটাকেই তারা ইবাদাত ও সালাত হিসাবে গণ্য করত। মহান আল্লাহ তা'আলা এহেন কাজের তীব্র তিরস্কার করেছেন। এ ধরনের বাতিল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং যারা এ ধরনের শ্রবণকে ইবাদাত মনে করে এবং এ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে তারা অবশ্যই তাদের কতক কর্মে অন্ধকারে রয়েছে। এ ধরনের শ্রবণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহর যে তিনটি যুগের প্রসংশা করেছেন, সে যুগের কোনো লোক করেন নি এবং বড় বড় মাশাইখদেরও কেউ করেন নি।

পক্ষান্তরে, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গান শ্রবণ করা, কেবলমাত্র স্ত্রী ও শিশুদের বৈশিষ্ট। যেমন এ মর্মে আসার (সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আসার বলে) বর্ণিত হয়েছে। কারণ, ইসলাম শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এতে কোনোরূপ সংকীর্ণতা নেই।

সালাত দীনের খুঁটি:

আর দীনের অন্যতম খুঁটি যা ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা হয় না তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত। এর প্রতি অন্যান্য বিধানের তুলনায় অধিক যত্নবান হওয়া মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- তার কর্মচারীদের প্রতি এ মর্মে চিঠি লিখতেন যে, আমার নিকট আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সালাত আদায় করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার হিফাযত করল ও যথারীতি পালন করল সে তার দীনকে সংরক্ষণ করল ও দীন কায়েম করল। আর যে এটাকে নষ্ট করল তার পক্ষে অন্যসব কাজ নষ্ট করা অধিকতর সহজ। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ওয়াজিবকৃত ইবাদাত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। আল্লাহ তা'আলা সালাত ওয়াজিব করার দায়িত্ব মি'রাজের রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সরাসরি কথোপোকথনের মাধ্যমে পালন করেন।

পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্ব মূহুর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সর্বশেষ অসিয়ত সালাতের বিষয়ে করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন।

«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»

"সালাতের প্রতি যত্নবান হও! সালাতের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তোমাদের কৃতদাসীর প্রতি যত্নবান হও"।[74]

বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাতই হলো, সর্বশেষ ইবাদাত যাকে দীন হারিয়ে ফেলবে। যখন সালাত চলে যাবে,

[74] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৯

তখন পূরো দীনই চলে যাবে। এটি দীনের মৌলিক খুঁটি। যখনই খুঁটি চলে যাবে তখন দীন ঢলে পড়বে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»

“সকল কর্মের মূল হলো ইসলাম। তার খুঁটি হলো সালাত। আর এর সর্বোচ্চ চুড়া হলো আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় জিহাদ করা”।[75]

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم: ٥٩]

“তাদের পর আসলো অপদার্থ উত্তরসূরীগণ, যারা সালাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নষ্ট করা অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া। আর যদি তারা সালাত পরিত্যাগ করে তাহলে অবশ্যই কাফির হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]

“তোমরা সালাতের হিফাযত কর এবং হিফাযত কর মধ্যবর্তী সালাতের”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

সালাতের যত্ন নেওয়া হলো সঠিক সময়ে তা সম্পাদন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: ٤، ٥]

---

[75] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৫

“ঐ সকল সালাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস। যারা তাদের সালাত বিষয়ে উদাসীন”। [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

এরা হলো ঐসব লোক যারা সালাত বিলম্বে আদায় করে অর্থাৎ যখন সালাতের ওয়াক্ত চলে যায় তখন পড়ে।

মুসলিমগণ একমত যে, দিনের সালাতকে দেরি করে রাতে পড়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে রাতের সালাত বিলম্ব করে দিনে আদায় করা বৈধ নয়। এটি মুসাফির, অসুস্থ ও মুকিম কারো জন্যেই বৈধ নয়। তবে কোনো মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজনে দিনের সালাত যোহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে রাতের সালাত মাগরিব ও এশা এক ওয়াক্তে একত্র করে পড়া জায়েয আছে। এটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তেমনি বর্ষা ও অনুরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায়ও দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, তারা তাদের সাধ্যমত (সময়ে) সালাত আদায় করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ١٦﴾ [التغابن: ١٦]

“তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর”। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

“আমি তোমাদের যার ওপর রেখে যাচ্ছি তার ওপর আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তোমাদের পূর্বের যারা ধ্বংস হয়েছে, তার কারণ, তারা তাদের নবীদের বেশি বেশি প্রশ্ন করতে এবং মতবিরোধ করত। আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিশেধ করি, তোমরা তা থেকে বিরত থাক। আর আমি যখন কোনো বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিই তা সাধ্যমত তোমরা বাস্তবায়ন কর”।[76]

পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেলাওয়াত, পূর্ণ রুকু ও সাজদাহসহ সালাত আদায় করা মুসল্লির ওপর অপরিহার্য। যদি সে ওযু ভঙ্গকারী অথবা অপবিত্র হয় আর যদি পানি না পায় অথবা পানি পাওয়া সত্ত্বেও সে অসুস্থ, ঠাণ্ডা ও অনুরূপ কোনো কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করে, এমতাবস্থায় সে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ মণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে। তার পর সে সালাত আদায় করবে। উপরোক্ত কারণে আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী সালাত বিলম্ব করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কারা অন্তরীণ ব্যক্তি, আটক ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্তসহ নানা সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি, তাদের অবস্থার আলোকে সালাত আদায় করবে। আর যদি কেউ শত্রু এলাকায় অবস্থান করে তাহলে সে সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ١٠١ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ

[76] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮৮

حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢ فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠١، ١٠٣]

“আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে পর্যটন কর, তখন সালাত সংক্ষেপ [কসর] করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে। নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর যখন তুমি তাদের (মুমিনদের) মধ্যে থাকবে, আর তাদের জন্যে (সালাতে ইমামত করবে) সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে, অতঃপর যখন সাজদাহ সম্পন্ন করবে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয় এবং অন্য দল যারা সালাত পড়ে নি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে সালাত পড়ে এবং স্ব স্ব সতর্কতা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র -শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের ওপর নিপতিত হবে; এবং তাতে তোমাদের অপরাধ নেই-যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় সতর্কতা অবলম্বন কর এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। অনন্তর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ কর, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০১-১০৩]

মুসলিম শাসকদের প্রতি সকল পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষকে সালাত আদায়ের নির্দেশ জারী করা ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

"তোমরা তাদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে সে সালাত পরিত্যাগ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দাও"।[77]

সালাতের পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কোনো একটি হতে বিরত থাকে অথবা কোনো একটি ফরয ইবাদাত পরিত্যাগ করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহ এ মর্মে একমত যে, তার ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত কর্তৃক ইসলামে ফিরে আসার সমন জারী হবে। যদি সে তওবা করতঃ স্ব-দীনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।

উক্ত উলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, সালাত পরিত্যাগকারী দীন-চ্যুত কাফির। তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করা যাবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। কেউ বলেন, ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগকারী ডাকাত, হত্যাকারী ও বিবাহিত জিনাকারির ন্যায় হত্যা যোগ্য অপরাধী হবে।

সালাতের বিষয়টি হলো, মহা-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার মর্যাদাও সর্বাধিক। তাই সালাত পরি-ত্যাগকারীর শাস্তিও উপরোক্ত শাস্তির চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, সালাত হলো দীনের স্তম্ভ ও খুঁটি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে সব ইবাদতের ওপর সালাতের গুরুত্ব ও মহত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কখনো তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কখনো যাকাত, সবর, কুরবানী প্রভৃতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যথা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]

[77] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৬; সুনান তিরমিযী: ৪৪৫/৩

“আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। এটি বড়ই কঠিন, তবে বিনয়ী ব্যক্তিদের কথা আলাদা”।[78]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: ٢]

“সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর”। [সূরা আ-কাউসার, আয়াত: ২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য। তার কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]

আর কখনো ভালো আমল দ্বারা শুরু করেছেন এবং সালাত দ্বারা সমাপনী করেছেন। যেমন, সূরা মা‘আরিজ-এ বর্ণিত হয়েছে,

[78] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫, ৮৩, ১৬০; আরো দেখুন- সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৭; সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৬; সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ২০

﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ ١ لِّلۡكَٰفِرِينَ لَيۡسَ لَهُۥ دَافِعٞ ٢ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلۡمَعَارِجِ ٣ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ٤ فَٱصۡبِرۡ صَبۡرٗا جَمِيلًا ٥ إِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهُۥ بَعِيدٗا ٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبٗا ٧ يَوۡمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلۡمُهۡلِ ٨ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٩ وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا ١٠ يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ ١٣ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ ١٤ كَلَّآۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٥ نَزَّاعَةٗ لِّلشَّوَىٰ ١٦ تَدۡعُواْ مَنۡ أَدۡبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٧ وَجَمَعَ فَأَوۡعَىٰٓ ١٨ ۞إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤﴾ [المعارج: ١، ٢٤]

“এক ব্যক্তি জানতে চাইল সে আযাব সম্পর্কে যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কাফিরদের জন্য তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সে শাস্তি আসবে আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে যিনি (উচ্চ মর্যাদার অধিকারী) ঊর্ধ্ব গমনের পথগুলোর মালিক। ফিরিশতা এবং রূহ (জিবরীল) আল্লাহ তা‘আলার দিকে আরোহণ করবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং (হে নবী) ধৈর্য ধারণ করুন সুন্দর ও উত্তমভাবে। তারা সে দিনটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি তা নিকটে দেখতে পাচ্ছি। সে দিন আকাশ হবে গলিত রূপার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে রঙ্গিন পশমের মতো, সে দিন কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও তাদেরকে মুখোমুখি দৃষ্টির সম্মুখে রাখা হবে, সে দিন অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিনিময়ে তার সন্তানকে দিতে চাইবে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, আর তার আত্মীয় স্বজনদের যারা তাকে আশ্রয় দিত। এমনকি পৃথিবীর সকলকে, যাতে তা (উক্ত আযাব) থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। না, কখনো নয়, ওটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা চামড়া তুলে দিবে, জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে পেছনে ফিরে গিয়েছিল (আল্লাহ তা‘আলার হুকুম থেকে) এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ

জমা করত, অতঃপর তা আগলে রাখত, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই অস্থির মনা করে, বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে উৎকণ্ঠিত হয়, কল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ, তবে সালাত আদায়কারীরা এমন নয়। যারা তাদের সালাতে স্থির সংকল্প”। [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১–২৩]

সূরা মুমিনূনের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون : ١، ١١]

“অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। যারা অসার কার্য-কলাপ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে”। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১-১১]

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এর বিনিময়ে আমাকে ও আপনাদেরকে ঐ সকল ব্যক্তিদের ওয়ারিশ করেন যারা চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতুল ফিরদউস লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা আমার আপনাদের ও সকল মুমিন ভাইদের আমলনামা সমৃদ্ধ করেন।

«وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْحَمْدُ لله وَحْدَه. وَصَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا»

“আপনাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার রহমত ও বরকতের ধারা বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা এক আল্লাহ তা‘আলার জন্যে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বংশধর ও সহচরদের প্রতি শান্তি ও অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ হোক”। আমীন।